Pratidhwani the Echo
A Peer-Reviewed International Journal of Humanities & Social Science
ISSN: 2278-5264 (Online) 2321-9319 (Print)
Impact Factor: 6.28 (Index Copernicus International)
Volume-VI, Issue-I, July 2017, Page No. 35-54
Published by Dept. of Bengali, Karimganj College, Karimganj, Assam, India
Website: http://www.thecho.in

পাথরার মন্দির টেরাকোটা

তনয়া মুখার্জ্জী
সিনিয়র রিসার্চ ফেলো এস).ভি.এস.জি.সি., ইউ.জি.সি.), লোকসংস্কৃতি বিভাগ, কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়, কল্যাণী, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত
ড. সুজয়কুমার মণ্ডল
সহযোগী অধ্যাপক ও প্রাক্তন বিভাগীয় প্রধান, লোকসংস্কৃতি বিভাগ, কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়, কল্যাণী, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত

Abstract

Pathra is one of the important places of Radh Bengal of India which is known as 'Temple Village'. This temple village is situated in West Midnapur district of West Bengal and bank of River Kasai. This place is historically and culturally significant. At present there are 34 terracotta temples are situated and these are architecturally magnificent and significant. These temples were established by different land lord's patronization in different times at Pathra. Different styles of temple like Chala, Ratna, Rekha, Dalan, Deul etc. are founded in the temple designs of Pathra yet today. Particularly terracotta plaques fixed on temples comprises valuable elements for reconstructing the mythological, historical and socio cultural heritage. Incredible architectural and decorative skills can be traced through the terracotta temples of Pathra village. These are unique picas of Art and Architecture. Architectural style and designing style of the temples of this area reveal the profundity of the artisan. Moreover, the temple architecture of Pathra village reveals a rich heritage of the Indian architecture. The present paper will analyze the style, types, theme, designs and motif of these terracotta temples of 'Temple Village' Pathra.

Keywords: Temple, Terracotta, Architecture, Structure, Motif, Plaque, Decoration

১. ভূমিকা: কাঁসাই নদীর তীরবর্তী পশ্চিম মেদিনীপুরের একটি ছোট্ট গ্রাম হল পাথরা। বিভিন্ন ইতিহাসবিদ ও পুরাতত্ত্ববিদ এই গ্রামকে 'মন্দিরময় পাথরা' বলে উল্লেখ করেছেন। রাঢ়ের এই ছোট্ট গ্রামটিতে একসময় অনেকগুলি টেরাকোটার মন্দির প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, তবে তার সঠিক সংখ্যা আজ আর জানা যায় না। বর্তমানে এই গ্রামটিতে ক্ষত ও অক্ষত অবস্থায় ৩৪ টি মন্দির রয়েছে। বিভিন্ন জমিদারদের পৃষ্ঠপোষকতায় বিভিন্ন সময়ে পাথরায় এই মন্দিরগুলি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। 'মন্দিরময়' এই গ্রামটিতে চালা, রত্ন, দালান, মঞ্চ, রত্ন, দেউল প্রভৃতি রীতির মন্দিরের প্রতিষ্ঠা হয়েছিল। গঠনরীতির দিক থেকে সত্যিই এখানকার মন্দিরগুলি অভিনব। শুধু গঠনরীতি নয় বর্তমানে মন্দিরগুলির অবয়ব দেখলে বোঝা যায় খুব উন্নত মানের টেরাকোটার অলংকরণে সমৃদ্ধ ছিল এখানকার মন্দিরগুলি। তবে কালের কড়াল গ্রাসে এবং সঠিক সংস্কার ও সংরক্ষণের অভাবে এখানকার বহু মন্দির এবং মন্দিরের অলংকরণ নষ্ট হয়ে গেছে। তবুও পুরাতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্যে ভরা এই গ্রামে বহু দেশী বিদেশী পর্যটক, গবেষক, পুরাতত্ত্ববিদেরা আসেন মন্দিরময় পাথরার টেরাকোটা মন্দির স্থাপত্য পর্যবেক্ষণ করতে।

বর্তমান আমাদের এই গবেষণামূলক প্রবন্ধে আমরা আলোচনা করবো— পাথরা গ্রামের নামকরণের বুৎপত্তিগত অর্থ, পাথরা গ্রামে বসবাসকারী বিভিন্ন জমিদার বংশ, পাথরার টেরাকোটা মন্দির স্থাপত্যের রীতি, শৈলী, অলংকরণের বিষয়, মোটিফ, পর্যটন, সংস্কার ও সংরক্ষণ, বর্তমান অবস্থা প্রভৃতি প্রসঙ্গে।

২. পাথরা নামকরণের বুৎপত্তিগত অর্থ ও ইতিহাস: নবাব আলীবর্দী খাঁর সময় রাঢ় বঙ্গের এই অবিভক্ত মেদিনীপুর জেলার পাথরা গ্রামটি রতনচক পরগণার অন্তর্ভূক্ত ছিল। আর পাথরা নামকরণের ইতিহাস প্রসঙ্গে স্থানীয় গবেষক ইয়াসিন পাঠান যে কাহিনিটি আমাদের শুনিয়েছেন সেটি হল (ইয়াসিন পাঠান, ব্যাক্তিগত সাক্ষাৎকার, ২৫এপ্রিল, ২০১৭)— এই রতনচক থেকে পাথরা নামের যে বুৎপত্তিগত অর্থ পাওয়া যায় সেটি হল— রতনচক> পাউথরা> পাথরা। তৎকালীন সময়ে নবাব আলিবর্দী খাঁ ছিলেন বাংলা, বিহার, উড়িষ্যার নবাব বা সুবেদার। আলিবর্দীর খাঁর তত্ত্বাবধানে কয়েক হাজার পরগণা ছিল। রতনচক নামক পরগণাটিও ছিল সেইসময় তাঁর তত্ত্বাবধানে। এই রতনচক পরগণার নায়েব ছিলেন বিদ্যানন্দ ঘোষাল। বিদ্যানন্দের কাজ ছিল প্রজাদের কাছ থেকে খাজনা আদায় করে সেরেস্তায় জমা করা এবং পরে তা নবাবের দপ্তরে পৌঁছে দেওয়া। বাংলায় যাকে নায়েব বলা হয় উর্দুতে তাকে বলা হয় মুসমাদার। এ প্রসঙ্গে উল্লেখ্য যে বিদ্যানন্দ নায়েব বা মুসমাদার পদে যোগদান করার আগে পর্যন্ত সামন্য এক দরিদ্র পূজারি ব্রাহ্মণ ছিলেন। ভাগ্যচক্রে এবং ঘটনাচক্রে তিনি রতনচক পরগণার নায়েব হিসাবে নিযুক্ত হন। এর কিছুকাল পর বিদ্যানন্দের গুরুদেব তাঁর গৃহে এসে উপস্থিত হন এবং অবাক হয়ে যান যে সামান্য এক পূজারি ব্রাহ্মণ থেকে বিদ্যানন্দের এই প্রভাব প্রতিপত্তি অর্থাৎ নায়েব হওয়া দেখে। এরপর বিদ্যানন্দ তাঁর খাজনা আদায়ের সমস্ত অর্থ তাঁর গুরুদেবের পায়ে অর্পণ করে দেন। কিন্তু গুরুদেব সেই অর্থ নেন না, বিদ্যানন্দ কে ফিরিয়ে দেন। আর বলেন আমি একজন সন্ন্যাসী মানুষ আজ এখানে কাল সেখানে করে ঘুরে বেড়ায়, আমার এই অর্থের কোন প্রয়োজন নেই বরং এই অর্থ তুমি ধর্মীয় ও সেবামূলক কাজে ব্যবহার করো, যাতে সাধারণ মানুষ উপকৃত হয়। গুরুদেবের কথা মতো বিদ্যানন্দ আদায় করা খাজনার অর্থ এই পরগণার মানুষদের জন্য সেবামূলক এবং ধর্মমূলক কাজে ব্যবহার করতে লাগলেন। কিন্তু একজন নায়েবের দায়িত্ব ও কর্তব্য হল আদায় করা খাজনার অর্থ সময়মতো নবাবের দরদারে পৌঁছে দেওয়া। কিন্তু বিদ্যানন্দ তার দায়িত্ব পালন করেননি, যার ফলে নবাবের সৈন্যরা এসে বিদ্যানন্দকে নবাবের দরবারে বন্দী করে নিয়ে যায়। সেই সময়কার অপরাধের শাস্তির নিয়ম অনুযায়ী বিদ্যানন্দের শাস্তিও হয়। এরপর নায়েবের সৈন্যরা রতনচক পরগণায় ঢাক ঢোল বাজিয়ে এলাকাবাসীদের জানিয়ে দেয় যে বিদ্যানন্দ একজন 'তছরূপকারী', সে প্রজাদের কাছ থেকে আদায়কৃত খাজনার টাকা নবাবের দরবারে জমা দেয় নি। তাই তাঁর শাস্তি স্বরূপ এবং এই পরগণায় যাতে পরবর্তীকালে এই রকম কাজ করতে কেউ সাহস না পায়, তাই বিদ্যানন্দকে হাত পা বেঁধে মাঠের মধ্যে পাগলা হাতির সামনে ফেলে দেওয়া হয়। কিন্তু সেই পাগলা হাতি বিদ্যানন্দকে পর পর তিনবার পাশ কাটিয়ে চলে যায়, তার কিছু মাত্র ক্ষতি সাধন করে না। এই সংবাদ নবাবের কানে পৌঁছালে নবান বিদ্যানন্দকে ডেকে পাঠান এবং সমস্ত বৃতান্ত জানতে চান। তখন বিদ্যানন্দ তাঁর গুরুদেবের বলা সমস্ত কথা নায়েবকে জানান। এই ঘটনা শুনে নবাব সন্তুষ্ট হয়ে বিদ্যানন্দের শাস্তি মকুব করেন এবং তাঁকে রতনচক পরগণাটি দান করে দেন। এরপর বিদ্যানন্দ সেবামূলক এবং ধর্মমূলক কাজে নিজেকে আত্ম- নিয়োজিত করেন। এর কিছুদিন পর বিদ্যানন্দ মারা যান। তারপর তাঁর প্রথম পক্ষের স্ত্রীর প্রথম সন্তান রত্নেশ্বর এই পরগণার জমিদার হিসাবে নিযুক্ত হন। রত্নেশ্বর নিজের বাবার স্মৃতিকে চিরদিন অমর করে রাখার জন্য অর্থাৎ তার পিতা বিদ্যানন্দ যে পাগলা হাতির পদতলে পিষ্ট না হয়ে পরপর তিনবার মৃত্যুমুখ থেকে ফিরে এসেছে সেইজন্য রতনচক পরগণার নাম বদল করেন রত্নেশ্বর। এই পরগণার নতুন নাম রাখেন পাথরা, তার কারণ তাঁর পিতা পাগলা হাতির পদতলে পিষ্ঠ না হয়ে মৃতুকে উত্তরণ করে অর্থাৎ উতরে বেঁচে ফিরেছেলেন তাই এইরকম নামকরণ।

৩. পাথরার জমিদার ও তাঁদের পরিচয়: বিদ্যানন্দ ঘোষালের মৃতুর পর তাঁর পুত্র রত্নেশ্বর ঘোষাল পাথরার জমিদারিত্ব লাভ করেন। এই সময় ঘোষালেরা নবাবের কাছ থেকে মজুমদার উপাধি পান। পরবর্তীকালে মজুমদার বংশের কোন বংশধর না থাকায় এই জমিদারিত্ব মজুমদার বা ঘোষাল পরিবারের কেউ পায়নি। এই মজুমদার

উপাধিধারী জমিদাররা ছিলেন বিত্তবান ও ধর্মপরায়ণ। মজুমদারদের সহায়তায় সেই সময় পাথরা গ্রামে কাঁসাই নদীর তীরে অনেকগুলি টেরাকোটার মন্দির গড়ে ওঠে। আগেই আমরা উল্লেখ করেছি মজুমদার বংশের কোন উত্তরসূরী ছিল না, যার ফলে মজুমদার বংশের পর পাথরার জমিদারিত্ব পান মজুমদার বংশের দৌহিত্র বন্দ্যোপাধ্যায় বংশ। বন্দ্যোপাধ্যায় বংশের জমিদারিত্বের আমলেও পাথরা গ্রামের ভেতর নির্মিত হয়- রাসমঞ্চ, কাছারি মহল, বিভিন্ন শিব মন্দির ইত্যাদি। এরপর জমিদারিত্ব হস্তান্তরিত হয় বন্দ্যোপাধ্যায়দের দৌহিত্র মুখোপাধ্যায়দের কাছে। এঁরা আবার পরবর্তীকালে বক্সী উপাধিতে ভূষিত হন। এঁদের পৃষ্ঠপোষকতাতে এই গ্রামে বেশ কিছু মন্দির প্রতিষ্ঠিত হয়। কাজেই জমিদারী হস্তান্তরিত হয় মুখোপাধ্যায়দের দৌহিত্র ভট্টাচার্যদের কাছে। ভট্টাচার্য পরিবারের সহায়তাতেও এখানে বেশ কিছু মন্দির নির্মিত হয়। এইভাবে বিভিন্ন জমিদার বংশের সহায়তা ও পৃষ্ঠপোষকতায় পাথরা গ্রামে সংখ্যাধিক টেরাকোটার মন্দির নির্মিত হয়। তবে এই গ্রামে কটি টেরাকোটার মন্দির ছিল তার সঠিক সংখ্যা জানা যায় না। বর্তমানে এই গ্রামে ৩৪ টি মন্দির রয়েছে, যার মধ্যে কয়েকটি অক্ষত অবস্থায় রয়েছে আবার কয়েকটি ভগ্নপ্রায় অবস্থায় রয়েছে। বেশ কিছু মন্দির প্রাকৃতিক দুর্যোগ আর বেশ কিছু মন্দির নদী গর্ভে বিলীন হয়ে গেছে। আবার অনেক মন্দিরের বিগ্রহ চুরি হয়ে যাওয়ার ফলে খালি মন্দিরের অবয়বটা পড়ে থাকায় স্থানীয় মানুষেরা সেইসব মন্দিরগুলি ভেঙে তার ইঁট দিয়ে নিজেদের ঘর বাড়ি তৈরি করে নেয় বলে জানা যায় (ইয়াসিন পাঠান, ব্যাক্তিগত সাক্ষাৎকার, ২৫এপ্রিল, ২০১৭)।

৪. পাথরা গ্রাম এবং বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠী: পাথরার জমিদার মজুমদাররা নিজেদের জমিদারী পরিচালনার জন্য বিভিন্ন অঞ্চল থেকে কামার, কুমোর, ছুতোর, নাপিত প্রভৃতি জাতি গোষ্ঠীর মানুষ নিয়ে এসে এই গ্রামে থাকতে দেয় এবং তাদের কিছুটা অংশ করে চাষযোগ্য জমি দান করেন। এখনও পাথরা গ্রামে কামার, কুমোর, লাঠিয়াল প্রভৃতি শ্রেণির লোকেদের বসবাস দেখা যায়। পাথরার পার্শ্ববর্তী গ্রামগুলিতে যে মুসলিম পরিবারের লোকেরা বসবাস করে, শোনা যায় তাঁদের পূর্বপুরুষেরা জমিদারী আমলে জমিদারদের লাঠিয়াল ছিল। কিন্তু বর্তমানে এই গ্রামে মুখোপাধ্যায়, মজুমদার, বন্দ্যোপাধ্যায় ও ভট্টাচার্য পরিবারের একটি করে পরিবার রয়েছে। এছাড়া অন্যান্য সম্প্রদায়ের যারা রয়েছে তাদেরকে জমিদারেরা নিজেদের জমিদারীর কাজের জন্য অন্য জায়গা থেকে নিয়ে এসে এখানে বসতি স্থাপন করান।

পাথরা গ্রামের বেশিরভাগ গৃহই তৈরি হয়েছে রাজাদের অট্টালিকা ও মন্দিরের চটি ইঁট দিয়ে। এ প্রসঙ্গে গ্রামের অধিবাসীরা বলেন জমিদারদের যখন ক্ষমতা ও প্রভাব প্রতিপত্তি ছিল তখন তাঁরা গ্রামের মানুষদের প্রতি খুব নির্যাতন করতো। তাই জমিদারদের যখন প্রভাব প্রতিপত্তি খর্ব হয় এবং বিভিন্ন মন্দির থেকে যখন বিগ্রহ চুরি হয়ে যেতে থাকে তখন গ্রামের অধিবাসীরা জমিদারদের অট্টালিকা এবং বিভিন্ন খালি মন্দির ভেঙে তার ইঁট দিয়ে নিজেদের ঘর বাড়ি করে নিতে থাকে, তার নিদর্শন এখনও পাথরা গ্রামে দেখতে পাওয়া যায়।

৫. পাথরার মন্দির ও তার জনশ্রুতি: পাথরার জমিদাররা শৈব্য ধর্মের উপাসক ছিলেন। তাই এই গ্রামে শিবের মন্দিরের সংখ্যাই বেশি। শিবের মন্দির ছাড়াও এখানে রয়েছে শীতলা, ধর্মরাজ, কালাচাঁদ, দুর্গা প্রভৃতি দেব-দেবীরও মন্দির। বর্তমানে এখানে ১৬ টি মতো শিব মন্দির রয়েছে। এইসব মন্দিরগুলিকে ঘিরে নানান জনশ্রুতিও শোনা যায়। নিম্নে এই গ্রামের বিভিন্ন মন্দিরের জনশ্রুতি সম্পর্কে আলোচনা করা হল:

৫.১. মাকড়া পাথরের দুর্গা মন্দির সম্পর্কিত জনশ্রুতি: এই গ্রামে মজুমদারদের যে ভগ্নপ্রায় মাকড়া পাথরের দুর্গা মণ্ডপটি রয়েছে, তাতে দুর্গা পূজার সময় ১০০ টি মোষ ও পাঁঠা বলি দেওয়া হতো। এখনও ভগ্নপ্রায় মন্দিরটিকে আমরা দেখি, সেখানে রয়েছে বলি দেওয়ার জায়গা, যূপকাষ্ঠ এবং একটি নালা। এই নালা দিয়ে বলিদানের রক্ত কাঁসাই নদীর জলে গিয়ে পড়তো। এখনো চাপা পড়া পাথরের দু-তিন ফুট নিচে সেই নালার অস্তিস্ব রয়েছে। পাথরা গ্রামের বাসিন্দা কালীপদ দলুই নামক এক ব্যাক্তির ঠাকুরদার দুর্গা পূজার আগে কাজ ছিল সারা এলাকা ঘুরে দুর্গা পূজার বলিদানের জন্য নিখুঁত পাঁঠা ও মোষ খুঁজে নিয়ে আসা। এই পাঁঠাগুলি যেন বিভিন্ন রঙের না হয় অর্থাৎ একই

রঙের হতে হবে। একবার পূজার আগে বলিদানের পাঁঠাগুলি নিয়ে আসার সময় একটা পাঁঠার পা ভেঙে যায় বা মুচকে যায়। তারপর পাঁঠাগুলি নিয়ে কালীপদের ঠাকুরদা যূপকাষ্ঠের কাছে পৌঁছায় তখন সেই খুঁতওয়ালা পাঁঠাটি দেখে জমিদারেরা ক্ষেপে যায় এবং হাতে খড়্গ নিয়ে বলে, পাঁঠার বদলে আজ তোকে বলি দেবো। সেই পরিস্থিতিতে কালীপদর ঠাকুমা হাতে বঁটি নিয়ে রণমূর্তি ধারণ করে নিজের স্বামীকে রক্ষা করেন (পাঠান, ইয়াসিন, ব্যাক্তিগত সাক্ষাৎকার, ২৫এপ্রিল, ২০১৭)। জমিদারী আমলে এই মাকড়া পাথরের দুর্গা মন্দিরে খুব জাঁকজমক করে দুর্গা পূজা করা হত।

৫.২. ধর্মরাজ মন্দির: একেবারে কাঁসাই নদীর তীর ঘেঁষে এই ধর্মঠাকুরের মন্দিরটি অবস্থিত। বর্তমানে মন্দিরটির সেবাইত হলেন ভট্টাচার্য পরিবারের পঙ্কজ ভট্টাচার্য, প্রফুল্ল ভট্টাচার্য এবং প্রভাস ভট্টাচার্য। এই মন্দিরের দেবতা ধর্মরাজজী বর্তমানে ধর্মরাজ মন্দিরে নেয় তিনি ভট্টাচার্যদের বাড়িতেই সেবা পাচ্ছেন। এই মন্দিরের বিগ্রহটি গোবর্ধন পণ্ডিত নামক এক ব্যাক্তি অন্নদাচরণ ভট্টাচার্যকে দিয়ে যান, ধর্মরাজের সাড়ে সাত বিঘে জমি সহ।
এই মন্দিরের দুটি কুঠুরিতে দুটি বিষধর সাপকে বসে থাকতে দেখা যেত। গ্রামবাসীরা মনে করতো এই সাপ দুটি ধর্মঠাকুরের আর এক রূপ। বৃষ্টি ও রোদের হাত থেকে বাঁচার জন্য গ্রামবাসীরা যখন মন্দিরের মধ্যে আশ্রয় নিত তখন সাপ দুটো কিন্তু কাউকে কামড়াতো না বা কারো কোনো ক্ষতি করতো না। এছাড়া এই মন্দিরের কুঠুরিতে রয়েছে মৌমাছির-চাক। এই মন্দির প্রাঙ্গনে মৌমাছিরা সদা সর্বদা ঘুরে বেড়ায় কিন্তু এই মৌমাছিরা আজ অব্দি কাউকে কামড়াইনি। মন্দিরের একটি সাপকে আনন্দপুর গ্রামের এক সাপুড়ে একবার ধরে নিয়ে যায়। সেই রাতেই সেই সাপুড়ের স্বাপ্নাদেশ হয় যে তুমি আমাকে আমার জায়গায় ফিরিয়ে দিয়ে এসো, না হলে তোমার সমূহ বিপদ ঘটবে। এই স্বপ্নাদেশ পেয়ে পরের দিন সকালেই সেই সাপুড়ে সাপটাকে মন্দির প্রাঙ্গনে ছেড়ে দিয়ে ধর্মরাজের পূজা দিয়ে যায় (ভট্টাচার্য, প্রভাষ, ব্যাক্তিগত সাক্ষাৎকার, ২৪ এপ্রিল, ২০১৭)।

৫.৩. নবরত্ন মন্দির: মজুমদার বংশের এক জমিদার মায়ের সাথে বিবাদের ফলে মাকে বদ্ধ ঘরে আটকে রেখে এই নবরত্ন রীতির মন্দিরটি তৈরি করবেন বলে ঠিক করেন। মন্দিরটি তৈরির ঠিক পরেই মন্দির প্রতিষ্ঠার আগের দিন মন্দিরটির ওপর বজ্রাপাত হয়। যার ফলে মন্দিরটি অভিশপ্ত হয়ে যায় সেই জন্য মন্দিরটিতে কোন বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করা যায় না। সেই থেকে এই মন্দিরটি মূর্তি বিহীন পরিতক্ত্য অবস্থাতেই পড়ে রয়েছে, কোন দিনই এই পরিতক্ত্য মন্দিরটিতে পূজা-অর্চনা হয় নি বলে জানা যায় (ভট্টাচার্য, প্রভাষ, ব্যাক্তিগত সাক্ষাতকার, এপ্রিল ২৪, ২০১৭)।

৫.৪. রত্নেশ্বরজীউর শিব মন্দির: পাথরা বা আশেপাশের গ্রামের লোকেরা রত্নেশ্বরজীকে নিজেদের গ্রাম দেবতা বলে মনে করেন। পূর্বে রত্নেশ্বরের আটচালা একটি মন্দির ছিল কিন্তু সেটা ভেঙ্গে পড়ায় গ্রামবাসীরা সেই স্থানে একটি নতুন মন্দির নির্মাণ করেন।

রত্নেশ্বর মন্দিরের ঠিক সামনে রয়েছে একটি বিরাট হিজল গাছ। এই হিজল গাছের তলায় প্রতি বছর ধূমধাম করে চড়কের মেলা ও গাজন উৎসব পালিত হয়। এই গাজন উৎসবের বিশেষ আকর্ষণ হল—রজা ফোঁর, জিব ফোঁর, পিঠ ফোর এবং চড়কের মেলা। এই চড়ক উপলক্ষ্যে তিন দিন ধরে এখানে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান হয়। এখানকার কোন মানুষ যদি অসুবিধায় পড়ে বা তার শারীরিক কোন সমস্যা হয় তাহলে তারা বাবা রত্নেশ্বরের কাছে মানত করে। সেই মনোবাঞ্ছা পূরণ হলে তারা গাজনের সময় বাবার মন্দিরে দণ্ডী কেটে জল ঢালে এবং বাবার উদ্দেশ্যে প্রসাদ নিবেদন করে। এই গ্রামের পঞ্চানন মাইতির ছেলের হৃদ যন্ত্রে ফুটো হয় এবং সে সন্তানের আরোগ্য কামনায় গাজনের সময় তার ছেলেকে বাবার লেৎ লালায় ফেলে দেয়। এরপর তার ছেলের হৃদযন্ত্রের অপারেশন হয় এবং বর্তমানে সে সুস্থ আছে। এই ঘটনার পর গ্রামবাসীরা এবং পঞ্চাননের পরিবারের লোকেরা বিশ্বাস করে বাবার দয়াতেই তার ছেলে জীবন ফিরে পেয়েছে।

৬. পাথরার টেরাকোটা মন্দির স্থাপত্যের রীতি ও পরিচয়: পূর্বেই আলোচনা করা হয়েছে যে পাথরা গ্রামে কতগুলো মন্দির ছিলো তার সঠিক সংখ্যা জানা যায় না। তবে বর্তমানে এই গ্রামটিতে ৩৪ টি মন্দিরের অস্তিত্ব পাওয়া যায়। পাথরা গ্রামে যে টেরাকোটার মন্দিরগুলি রয়েছে সেই মন্দিরগুলিতে অলংকরণের প্রাচুর্য সেভাবে চোখে পড়ে না। কাঁসাই নদীর পাশ্ববর্তী এই ছোট্ট গ্রামটিতে যে সব রীতির মন্দির গড়ে উঠেছে তা সত্যিই বিস্ময়ের বিষয়। বাংলার টেরাকোটা মন্দির স্থাপত্যের রীতিকেই অনুসরণ করেই এখানকার মন্দির স্থাপত্যগুলি গড়ে উঠেছিল। তবে মেদিনীপুরের পাশ্ববর্তী স্থান ওড়িশা হওয়ায় স্বাভাবিকভাবেই ওড়িশার মন্দির স্থাপত্যের রীতির প্রভাব বেশ খানিকটাই এই গ্রামের মন্দির স্থাপত্যের উপর পড়েছে। মন্দিরময় এই গ্রামে যেসব ধরনের টেরাকোটা মন্দির স্থাপত্য দেখা যায় তা নিম্নে একটি ছকের সাহায্যে দেখানো হল:

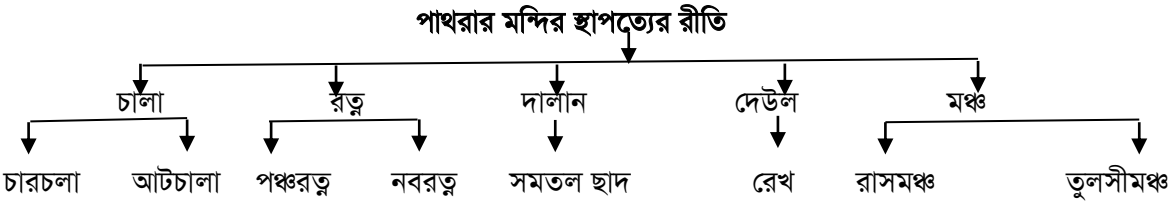

মন্দিরময় এই ছোট্ট গ্রামটিতে আমরা চারচালা, আটচালা, পঞ্চরত্ন, নবরত্ন, সমতল ছাদ, রেখা, রাসমঞ্চ, তুলসীমঞ্চ ইত্যাদি রীতির মন্দির দেখতে পাই। একটা গ্রামে একসঙ্গে এতগুলো রীতির মন্দির গড়ে ওঠা সত্যিই বিস্ময়কর ব্যাপার এবং যা এখানকার মন্দির স্থাপত্যের একটি স্বকীয়তার দিকও বটে। এবারে আমরা এই সমস্ত রীতির মন্দিরগুলি প্রসঙ্গে আলোচনা করবো:

৬.১. চালা: চালা রীতি হচ্ছে বাংলার একান্ত নিজস্ব স্থাপত্য রীতি। বাংলায় দোচালা, চারচালা, আটচালা, বারোচালা, জোড়বাংলা, রত্ন সহ জোড় বাংলা ইত্যাদি রীতির মন্দির দেখা যায়। কিন্তু পাথরা গ্রামে আমরা চারচালা আর আটচালা রীতির মন্দির দেখতে পাই। চালা রীতির মন্দিরের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল কালাচাঁদের দালানের পশ্চিমদিকে তিনটি চারচালা রীতির শিব মন্দির এবং পূর্বদিকের আটচালা রীতির শিব মন্দিরটি। এখানকার আটচালা রীতির রত্নেশ্বর শিব মন্দিরটি অনেক আগেই ধ্বংস হয়ে গেছে। সেই স্থানে আবার গ্রামবাসীরা নতুন মন্দির স্থাপন করেছে।

৬.১.১. তিনটি চারচালা ও একটি আটচালা রীতির শিব মন্দির: কালাচাঁদের দালানের পশ্চিমদিকে তিনটি চারচালা রীতির মন্দির এবং পূর্বদিকে একটি আটচালা রীতির শিব মন্দির রয়েছে। এই মন্দিরের একটি মন্দিরের গায়ে লেখা আছে মন্দিরটি ১৭৭১ শকাব্দ অর্থাৎ ১২৫৫ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। এই মন্দিরগুলিতে পঙ্খ ও টেরাকোটার অলংকরণ অল্প বিস্তর দেখা যায়। অতীতে এই মন্দিরগুলিতে যে প্রচুর টেরাকোটার অলংকরণ ছিল তা মন্দিরগুলি দেখলেই বোঝা যায়। এই মন্দিরগুলির টেরাকোটার ফলকগুলিতে রয়েছে বিভিন্ন প্রকারের ফুলের মোটিফ, এছাড়া মন্দিরের অভ্যন্তরে পৌঁছানোর দুই পার্শ্বে রয়েছে দ্বারপাল, আর রয়েছে জ্যামিতিক নকশা ও পৌরাণিক ঘটনার নানান ফলক যেমন—দশাবতার, দশমহাবিদ্যা, বিভিন্ন পৌরাণিক দেবদেবী ইত্যাদি (দ্রষ্টব্য চিত্র নং- ১ ও ২)।

চিত্র নং- ১ চালা রীতির শিব মন্দির

চিত্র নং- ২ চালা রীতির শিব মন্দিরের সম্মুখ অংশ

৬.২. রত্ন: পশ্চিম বাংলার অঞ্চলের অঞ্চলের অর্ন্তগত পশ্চিম মেদিনীপুর জেলায় রত্ন শৈলীর মন্দির অধিক সংখ্যায় দেখা যায়। পাথরা গ্রামটি এর থেকে ব্যাতিক্রম নয়। পশ্চিম বাংলায় যে যে রীতির রত্ন মন্দির দেখা যায় সেগুলি হল— একরত্ন, পঞ্চরত্ন, নবরত্ন, একাদশরত্ন, ত্রয়োদশরত্ন, পঞ্চদশরত্ন, সপ্তদশরত্ন, একবিংশতিরত্ন, পঞ্চবিংশতিরত্ন ইত্যাদি। রত্ন রীতির মন্দিরের মধ্যে এই গ্রামে আমরা পঞ্চরত্ন এবং নবরত্ন রীতির মন্দির দেখতে পাই।

৬.২.১. ধর্মরাজ মন্দির: এই ধর্মরাজ মন্দিরটি একেবারে কংসাবতীর নদীর ধার ঘেঁষে অবস্থিত। এটি পঞ্চরত্ন রীতির মন্দির। বর্তমানে এই মন্দিরটি ভট্টাচার্য পরিবারের তত্ত্বাবধানে রয়েছে। আর পুরাতাত্ত্বিক সবের্ক্ষণ বিভাগ এই মন্দিরটিকে সংস্কার করে সংরক্ষণ করেছে। মন্দিরের বিগ্রহ ধর্মরাজজী বর্তমানে মন্দিরে নেই, ভট্টাচার্যদের বাড়িতেই সেবা পাচ্ছেন। মন্দিরটিতে একসময় পঙ্খ ও টেরাকোটার অলংকরণ ছিল। কালের কড়াল গ্রাসে ও সঠিক সংরক্ষণের অভাবে মন্দিরটির অধিকাংশ অলংকরণই নষ্ট হয়ে গেছে (দ্রষ্টব্য চিত্র নং- ৩ ও ৪)।

চিত্র নং- ৩ পঞ্চরত্ন রীতির ধর্মরাজ মন্দির

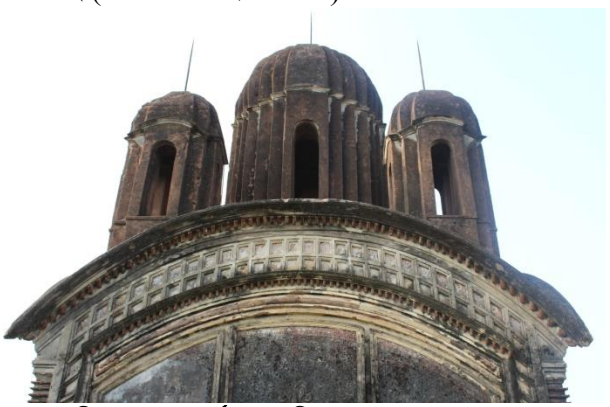

চিত্র নং- ৪ ধর্মরাজ মন্দিরের ওপরের অংশ

৬.২.২. পঞ্চশিব মন্দির: পঞ্চশিব মন্দিরটি পঞ্চরত্ন রীতির বলে একে পঞ্চশিব মন্দির বলা হয়। মন্দিরটি মজুমদাররা প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। মন্দিরটির উচ্চতা ৩০ ফুট মতো। প্রতিষ্ঠাফলক দেখে জানা যায় যে এই মন্দিরটি ১৭৪৯ শকাব্দে অর্থাৎ ইংরেজী ১৮২৮ খ্রীষ্টাব্দ ও বাংলা ১২৩৪ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়। এই মন্দিরটিও পুরাতাত্ত্বিক সর্বেক্ষণ বিভাগের তত্ত্বাবধানে রয়েছে। মন্দিরের অভ্যন্তরে প্রবেশের সম্মুখ অংশে লাঠি হাতে দ্বারপালকে দেখা যায়। মন্দিরটির সামনের অংশে টেরাকোটার নানান অলংকরণ যুক্ত ফলকও দেখা যায়। এর মধ্যে কিছু ফলক ভগ্ন

অবস্থায় রয়েছে আবার কিছু ফলক অক্ষত অবস্থায় রয়েছে। এই মন্দিরে যে সব টেরাকোটার অলংকরণগুলি রয়েছে সেগুলি হল: বিভিন্ন ফুল ও লতা পাতার মোটিফ, নানান পৌরাণিক দেবতা যেমন- কার্তিক, গণেশ, শিব, মহিষাসুর, রাম, লক্ষণ ইত্যাদি। এ প্রসঙ্গে উল্লেখ্য মন্দিরটির সামনের অংশে ভগ্ন অবস্থায় ফুল ও লতা পাতার এবং কিছু পঙ্খের অলংকরণ দেখা যায় (দ্রষ্টব্য চিত্র নং- ৫ ও ৬)।

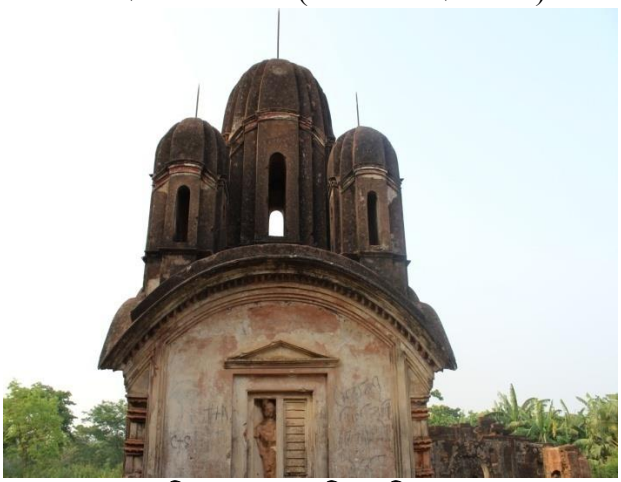

চিত্র নং- ৫ পঞ্চশিব মন্দির

চিত্র নং- ৬ পঞ্চশিব মন্দিরের রত্ন বা চূড়ার অংশ

৬.২.৩. তিনটি পঞ্চরত্ন রীতির শিব মন্দির: বন্দ্যোপাধ্যায়রা এই তিনটি পঞ্চরত্নরীতি বিশিষ্ট শিব মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন। প্রতিষ্ঠা লিপি থেকে জানা যায় ১৭৩৮ শকাব্দে অর্থাৎ ১২২৪ সনে এই মন্দির তিনটি প্রতিষ্ঠা হয়। এই মন্দির তিনটিকেও পুরাতাত্ত্বিক সর্বেক্ষণ বিভাগ সংস্কার করে সংরক্ষরণ করেছে। পূর্বমুখী এই তিনটি মন্দিরে নিত্য পূজা হয়। মন্দির তিনটির সামনের অংশে ও দুই পার্শ্বে টেরাকোটা ও পঙ্খের অলংকরণ দেখা যায় (দ্রষ্টব্য চিত্র নং- ৭ ও ৮)।

চিত্র নং- ৭ বন্দ্যোপাধ্যায়দের পঞ্চরত্ন রীতির তিনটি শিব মন্দির

চিত্র নং- ৮ বন্দ্যোপাধ্যায়দের পঞ্চরত্ন রীতির শিব মন্দির

৬.২.৪. পরিতক্ত্য নবরত্ন মন্দির: পশ্চিমমুখী নবরত্ন রীতির এই মন্দিরটি কংশাবতীর নদীর একেবারে তীর ঘেঁষে অবস্থিত। দ্বিতলে নয়টি চূড়া বিশিষ্ট এই মন্দিরটির উচ্চতা ৭৫ ফুট মতো। প্রথম তলের কাঠামোটির দৈর্ঘ্য ও প্রস্থ ২০

ফুট। প্রথম চারটি চূড়ার দৈর্ঘ্য ১২ ফুট করে, মাঝের চূড়ার দৈর্ঘ্য ২০ ফুট। দ্বিতলের চালার উচ্চতা ১৫ ফুট প্রতিটি চূড়ার দৈর্ঘ্য ১০ ফুট করে। পাথরায় অবস্থিত মন্দিরগুলির মধ্যে সর্বোচ্চ উচ্চতা বিশিষ্ট্য মন্দির হল এই পরিতক্ত্য নবরত্ন মন্দিরটি। এই মন্দিরটিকেও পুরাতাত্ত্বিক সর্বেক্ষণ বিভাগ সংস্কার করে সংরক্ষণ করেছে একসময় এই মন্দিরটিতে প্রচুর টেরাকোটার অলংকরণ ছিল। কিন্তু বর্তমানে সেই অলংকরণের প্রাচুর্য সেভাবে আর মন্দিরটিতে দেখা যায় না। প্রায় ১৫-২০ বছর আগে এই মন্দির থেকে অনেক টেরাকোটার ফলক অপহৃত হয়েছে বলে লোকমুখে শোনা যায়। এই মন্দিরে অবশিষ্ট যে ফলকগুলি রয়েছে তার বেশিরভাগটাই ভগ্ন বা অর্ধভগ্ন অবস্থায় রয়েছে। খুব কম সংখ্যক ফলকই অক্ষত অবস্থায় রয়েছে। মন্দিরটির পিলার, সামনের অংশ এবং ভিত্তিভূমির ওপরের অংশে টেরাকোটার ফলক দেখা যায় (দ্রষ্টব্য চিত্র নং- ৯ ও ১০)।

চিত্র নং- ৯ পরিতক্ত্য নবরত্ন রীতির মন্দির

চিত্র নং- ১০ পরিতক্ত্য নবরত্ন রীতির মন্দিরের নয়টি রত্ন

৬.৩. দালান: দালান রীতির মন্দিরের ভাগগুলি হল— ছোট চাঁদনী, দ্বিতল চাঁদনী, দুর্গাদালান, সমতল ছাদ ইত্যাদি। পাথরা গ্রামে আমরা বর্তমানে দুটি দালান রীতির সমতল ছাদের মন্দির দেখতে পাই। এই মন্দির দুটির একটি হল কালাচাঁদের দালান এবং অপরটি হল বন্দ্যোপাধ্যায়দের সমতল ছাদের শিব মন্দির।

৬.৩.১. কালাচাঁদের দালান কোঠা: দালান রীতির এই কালাচাঁদের মন্দিরটি মজুমদাররা তৈরি করেন। এলাকায় এই মন্দিরটি কালাচাঁদের দালালকোঠা নামে পরিচিত। এই মন্দিরটিও পুরাতাত্ত্বিক সর্বেক্ষণ বিভাগের তত্ত্বাবধানে রয়েছে। কালাচাঁদের দালান কোঠায় মোট তিনটি কুঠুরি রয়েছে। এক সময় এই মন্দিরের পুর্বদিকের কুঠুরিতে থাকতেন লক্ষী জনার্দন এবং পশ্চিমদিকের কুঠুরিতে কালাচাঁদজী থাকতেন। তার মাঝের কুঠুরি দিয়ে ভেতরে যাতাযাত করা যেত (দ্রষ্টব্য চিত্র নং- ১১)। বর্তমানে এই মন্দিরে কোন বিগ্রহের পূজা হয় না। এই কালাচাঁদের বিগ্রহের পূজা হয় মেদিনীপুরের বেরাবল্লভপুরের মজুমদারদের বাড়িতে। আর লক্ষী জনার্দন পূজা পাচ্ছেন ঠিক কংসাবতী নদীর ওপর প্রান্তে জনার্দনপুরে। এই মন্দিরটিতে টেরাকোটা বা পঙ্খের কোন অলংকরণ নেই।

৬.৩.২. সমতল ছাদের শিব মন্দির: এই সমতল ছাদের শিব মন্দিরটি বন্দ্যোপাধ্যায়রা প্রতিষ্ঠা করেন। মন্দিরটিতে কোন বিগ্রহ দেখা যায় না। পূর্বে এই মন্দিরটিতে শিবের নিত্য পূজা হতো। এটি ইঁটের তৈরি মন্দির এখানে পঙ্খ ও টেরাকোটার কোন অলংকরণ দেখা যায় না (দ্রষ্টব্য চিত্র নং- ১২)।

চিত্র নং- ১১ কালাচাঁদের দালান কোঠা

চিত্র নং- ১২ সমতল ছাদের শিব মন্দির

৬.৪. দেউল: বাংলার টেরাকোটা মন্দির স্থাপত্যের আর একটি রীতি হল দেউল রীতি। বাংলা তথা রাঢ় বাংলার অন্যান্য জেলার থেকে অবিভক্ত মেদিনীপুর জেলায় এই দেউল রীতির মন্দির বেশি পরিমানে দেখা যায়। এর সম্ভব্য কারণ হিসাবে বলা যায়, এই জেলার পাশেই অবস্থিত আমাদের প্রতিবেশী রাজ্য ওড়িষা। কারণ দেউল রীতির মন্দিরের ধারণা প্রথম ওড়িষা থেকে বাংলাতে আসে। বাংলাতে দেউল রীতির মন্দির মূলত ষোড়শ শতাব্দীর পর থেকে নির্মিত হতে থাকে। এই দেউল রীতির মন্দিরকে আমরা দুই ভাগে ভাগ করতে পারি—পীড়া দেউল আর রেখা দেউল। আবার পীড়া দেউলকে আমরা দুটি ভাগে ভাগ করতে পারি— শিখর শীর্ষ পীড়া আর স্তূপ শীর্ষ পীড়া। এই পাথরা গ্রামে আমরা দেউল রীতির মন্দিরের মধ্যে রেখা মন্দিরের সন্ধান পাই।

৬.৪.১. শীতলার মন্দির: পাথরা গ্রামের বন্দ্যোপাধ্যায়দের শীতলার মন্দিরটি বুড়িমার থান হিসাবেই পরিচিত। দক্ষিণমুখী ও উচ্চ ভিত্তিভূমির ওপর প্রতিষ্ঠিত এই মন্দিরটি রেখা মন্দিরের আদলে গঠিত। লোকমুখে শোনা যায় প্রায় ৬০ ফুট উচ্চতা বিশিষ্ট এই মন্দিরটি ওড়িষার কোর্ণাক মন্দিরের আদলে তৈরি হয়েছিল। এই মন্দিরে দেবী শীতলার নিত্য পূজা হয়। বর্তমানে মন্দিরটির সামনে অংশে ভগ্ন টেরাকোটার ফলক ছাড়া মন্দিরের অন্যত্র আর টেরাকোটার কোন অলংকরণ দেখা যায় না। মন্দিরটির শিখরের চূড়ায় পিতলের একটি কলসি বসানো রয়েছে (দ্রষ্টব্য চিত্র নং- ১৩ ও ১৪)।

চিত্র নং- ১৩ রত্ন রীতির শীতলার মন্দির

চিত্র নং- ১৪ শীতলার মন্দিরের সামনের অংশ

৬.৫. মঞ্চ: মঞ্চ রীতির মন্দিরকে আমরা তিন ভাগে ভাগ করতে পারি— রাসমঞ্চ, দোলমঞ্চ ও তুলসীমঞ্চ। দোলমঞ্চ ও তুলসীমঞ্চের তুলনায় রাসমঞ্চের সংখ্যা অধিক পরিমানে দেখা যায় এই বঙ্গদেশে। এই মন্দিরময় গ্রামটিতে আমরা কেবলমাত্র একটি রাসমঞ্চের এবং কয়েকটি তুলসী মঞ্চের সন্ধান পাই।

৬.৫.১. রাসমঞ্চ: পাথরা গ্রামের রাসমঞ্চটি বন্দ্যোপাধ্যায়দের আমলে প্রতিষ্ঠিত হয়। এটি বন্দ্যোপাধ্যায়দের কাছারি মহলের সম্মুখে অবস্থিত। এই রাসমঞ্চটি অষ্টকোণাকৃতি ও নয়টি চূড়া বিশিষ্ট। রাসমঞ্চের সমগ্র চূড়াটি দেখতে বেহারি রসূন বা ওলটানো পদ্মের মতো। আট কোণা বিশিষ্ট এই রাসমঞ্চের আটটি কোণেই রয়েছে পেখম তোলা ময়ূরের মূর্তি। প্রটিটি দরজার প্রবেশের দুই পার্শ্বে রয়েছে দ্বারপালিকা। রাসমঞ্চে যেহেতু রাস উৎসব অনুষ্ঠিত হতো তাই রাধিকার সখিরা প্রতিটি দরজার দুই পার্শ্বে রয়েছে দ্বারপালিকার ভূমিকায়। প্রটিষ্ঠা লিপি থেকে জানা যায় এই রাসমঞ্চটি ১৭৫৪ শকাব্দ অর্থাৎ ১৮২২ খ্রীষ্টাব্দ ও বাংলা ১২৩৯ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়। এই রাসমঞ্চটির চূড়াগুলির নীচে পঙ্খের অলংকরণে টবসহ ফুল গাছের মোটিফ দেখা যায়। এই রাসমঞ্চটিকেও কলকাতা মণ্ডলের পুরাতাত্ত্বিক সর্বেক্ষণ বিভাগ সংস্কার করে সংরক্ষণ করেছে (দ্রষ্টব্য চিত্র নং- ১৫ ও ১৬)।

চিত্র নং- ১৫ রাসমঞ্চ

চিত্র নং- ১৬ তুলসীমঞ্চ

৭. অলংকরণ শৈলী: প্রবন্ধের শুরুতেই বলা হয়েছে পাথরা গ্রামের টেরাকোটা মন্দিরগুলি অলংকরণের দিক থেকে খুব একটা উচ্চ মানের নয়। কারণ এখানকার অধিকাংশ মন্দিরেই টেরাকোটার অলংকরণ দেখা যায় না। কিন্তু মন্দিরগুলি দেখলে বোঝা যায় কোন এক সময় এইসব নানান রীতির মন্দিরগুলি কারুকার্যপূর্ণ অলংকরণে সমৃদ্ধ ছিল। প্রাকৃতিক বিপর্যয় ও সঠিক এবং বিজ্ঞানসম্মত সংরক্ষণের অভাবে বর্তমানে মন্দিরের অলংকরণগুলি নষ্ট হয়ে গেছে। আর যেসব মন্দিরগুলিতে আমরা টেরাকোটার অলংকরণ দেখতে পাই সেগুলি ভগ্ন বা অর্ধভগ্ন অবস্থায় রয়েছে। পাথরা গ্রামের যেসব মন্দিরগুলিতে আমরা অল্প বিস্তর যে টেরাকোটার অলংলরণ দেখতে পাই সেগুলি হল— পরিত্যক্ত নবরত্ন মন্দির, উত্তরমুখী ও পূর্বমুখী তিনটি চারচালা ও একটি আটচালা শিব মন্দির, পশ্চিম ও পূর্বমুখী তিনটি পঞ্চরত্ন মন্দির, বন্দ্যোপাধ্যায়দের তিনটি পঞ্চরত্ন রীতির শিব মন্দির, অষ্টকোণাকৃতি রাসমঞ্চ ইত্যাদি। নিম্নে এবার আমরা পাথরার টেরাকোটা মন্দির স্থাপত্যের অলংকরণ শৈলীর বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা করবো।

৭.১. ফলকের অবস্থান: পাথরা গ্রামে এখনও অবশিষ্ট যে কটি মন্দিরে অলংকরণ দেখা যায় তার মধ্যে টেরাকোটার সাথে সাথে সামান্য পরিমাণে পঙ্খের অলংকরণও দেখা যায়। মন্দিরময় এই গ্রামের বিভিন্ন পাড়ায় অবস্থিত ভিন্ন ভিন্ন জমিদারদের আমলে তৈরি হওয়া মন্দিরগুলিতে পৌরাণিক ঘটনা সম্বলিত বিভিন্ন ধরনের ফলকগুলিকে মন্দিরে প্রবেশের সম্মুখভাগের ওপরের অংশে লম্বা সারিবদ্ধ প্যানেলে আবার মন্দিরে প্রবেশের দুই পার্শ্বের প্যানেলেও

দেখা যায়। আবার পরিত্যক্ত নবরত্ন রীতির মন্দিরটিতে আমরা থাম বা Piller এর গায়েও ছোট ছোট টেরাকোটার ফলকে নানান পৌরাণিক ঘটনার দৃশ্য-ফলক দেখতে পাই। মন্দিরগুলিতে প্রবেশের সম্মুখভাগের একেবারে ওপরের অংশে বিভিন্ন পৌরাণিক দেব-দেবীর ফলক আমরা দেখতে পাই, যেমন— দুর্গা, শিব, কার্তিক, গণেশ ইত্যাদি। সমাজচিত্র সম্বলিত ফলকগুলিকে আমরা সাধারণত মন্দিরের নিচের অংশে দেখতে পাই। আর রয়েছে ঐতিহাসিক ঘটনা সম্বলিত ফলক যার অবস্থান হল— মন্দিরের দুই পার্শ্বে, থাম বা পিলার আর মন্দিরেরর কোনার অংশ। আর পঞ্চের অলংকরণগুলি মন্দিরের ঠিক সামনের অংশে টেরাকোটা ফলকের সাথেই দেখা যায়।

৭.২. ফলকের আকার: টেরাকোটা মন্দিরগুলিতে আমরা মন্দিরের অলংকরণের জন্য ছোট, বড়ো, লম্বাটে, চৌকোণা প্রভৃতি নানা ধরনের ফলকের ব্যবহার হতে দেখি। ইঁটের দেওয়ালে মূর্তিযুক্ত ফলকগুলিকে কোথাও একদম দেওয়ালের সাথে সেঁটে দেওয়া বা গেঁথে দেওয়া হয়েছে আবার কোথাও দেওয়ালের সঙ্গে ফলকগুলি লেগে না গিয়ে ওপরের দিকে উঠে এসেছে। ঘটনার ধারাবাহিকতা বজায় রাখার জন্য ছোট ছোট লম্বা আকারের চৌকোণা ফলকও সারিবদ্ধভাবে লম্বালম্বি বা আড়াআড়িভাবে ব্যবহার করা হয়েছে। বড়ো আকারের চৌকোণা একটিমাত্র ফলক ব্যবহার করেও কোন ঘটনা বা দৃশ্যচিত্রকে দেখানো হয়েছে। সামাজিক ও ঐতিহাসিক কাহিনি চিত্রের জন্য চ্যাপ্টা চৌকোণা আকারের ফলকের ব্যবহারই বেশি করা হয়েছে। উদ্ভিদজগৎ ও জ্যামিতিক নকশার মোটিফের জন্য লম্বা, চৌকোণা ও চ্যাপ্টা চৌকোণা ধরনের ফলক ব্যবহৃত হয়েছে। আর প্রাণীজগৎ এর মোটিফের জন্য সরু লম্বা ও চ্যাপ্টা চৌকোণা ফলকের ব্যবহার হতেই বেশি দেখা গেছে (দ্রষ্টব্য চিত্র নং- ১৭, ১৮, ১৯ ও ২০)।

চিত্র নং- ১৭, ১৮, ১৯ ও ২০ বিভিন্ন আকারের টেরাকোটার ফলক

৭.৩. ফলকের মাপ: বিভিন্ন মাপের চোট, বড়ো, লম্বা, চৌকোণা টেরাকোটার ফলক দিয়ে পাথরা গ্রামের মন্দিরগুলির অলংকরণ করা হয়েছে। পাথরায় যে সব শিল্পী কারিগরেরা এই টেরাকোটার মন্দিরগুলি তৈরি করেছিলেন তাঁরা তাঁদের নিজেদের ইচ্ছা বা খেয়াল খুশি মতো ফলকগুলি তৈরি করে মন্দিরগাত্রে প্রতিস্থাপিত করেননি। কাহিনি ও ঘটনা অনুযায়ী বিভিন্ন মাপের ফলক তৈরি করে তার নির্দিষ্ট জায়গা অনুযায়ী সেগুলি প্রতিস্থাপন করা হয়েছে। পৌরাণিক ঘটনা, সামাজিক ঘটনা, ঐতিহাসিক ঘটনা এবং বিভিন্ন ধরনের মোটিফের ফলকগুলি মন্দিরের কোন অংশে প্রতিস্থাপন করা হবে এবং কোন ফলকের পর কোন ফলক প্রতিস্থাপিত হবে সেই সমস্ত হিসাব নিকাশ করেই বিভিন্ন মাপের ফলক তৈরি করা হয়েছে। এখানকার মন্দিরের ফলকের মাপগুলি হল— ২X২ ইঞ্চি, ২X৩ ইঞ্চি, ৩X৪ ইঞ্চি, ৪X৪ ইঞ্চি, ৬X৬ ইঞ্চি, ৭X৭ ইঞ্চি, ৮X৮ ইঞ্চি, ৮X১০ ইঞ্চি, ১২X১০ ইঞ্চি, ১২X৮ ইঞ্চি, ১৪X১২ ইঞ্চি, ১৫X৬ ইঞ্চি, ১৬X৫ ইঞ্চি, ১৮X১২ ইঞ্চি ইত্যাদি। সমকালীন শিল্পীদের শিল্প কারিগরী দক্ষতা ও নৈপূণ্যতার জন্য মন্দিরগাত্রে প্রতিস্থাপিত টেরাকোটার ফলকগুলি দর্শকদের সামনে সজীব ও জীবন্ত রূপে পরিস্ফুট হয়েছে।

৭.৪. মূর্তির ধরণ ও গঠন: মন্দিরময় এই গ্রামের টেরাকোটা মন্দিরগুলিতে সমকালীন মন্দির নির্মাণকারী শিল্পী কারিগরেরা এমনভাবে টেরাকোটার ফলকগুলিকে প্রতিস্থাপন করেছে যে মন্দিরগুলির নান্দনিক গুণকে আরো বাড়িয়ে দিয়েছে। একই সঙ্গে বিভিন্ন পৌরাণিক দৃশ্য ও সামাজিক ঘটনার দৃশ্য সম্বলিত ফলকগুলি জীবন্তরূপে মন্দিরগাত্রে অবস্থান করে মন্দিরগুলির গুরুত্ব আরো বহুমাত্রায় বাড়িয়ে দিয়েছে। এক এক মন্দিরের ফলক এক এক রকম, যেমন পরিতক্ত্য নবরত্ন মন্দিরের ফলকের সাথে বন্দ্যোপাধ্যায়দের তিনটি পঞ্চরত্ন শিব মন্দিরের ফলকের বা আটচালা রীতির শিব মন্দিরগুলির ফলকের কোন মিল খুঁজে পাওয়া যায় না। ফলকগুলিতে প্রতিস্থাপিত মূর্তিগুলির বেশ, ভূষা, অলংকার, দাঁড়ানো ও বসার ভঙ্গিমা, মূর্তির গড়ন সবেতেই এই পার্থক্যের ছাপ সুস্পষ্ট। এ প্রসঙ্গে উল্লেখ্য এই গ্রামের টেরাকোটা অলংকরণযুক্ত প্রায় প্রতিটি মন্দিরেই আমরা মূল মন্দিরে প্রবেশের দুই পার্শ্বে দুটি করে দ্বারপালের ফলক দেখতে পাই। প্রতিটি মন্দিরের দ্বারপালের মূর্তির গঠন, বেশ, ভূষা, পোষাক, পরিচ্ছদ, দাঁড়ানোর ভঙ্গিমা এক এক রকম, কারোর সঙ্গে কারোর সাদৃশ্য পরিলক্ষিত হয় না। প্রত্যেকটি মূর্তি ফলকের নিজস্ব স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য রয়েছে। আবার পৌরাণিক ঘটনা যুক্ত একই ধরনের সাদৃশ্য যুক্ত ফলক একাধিক মন্দিরে প্রতিস্থাপন করা হয়েছে। প্রতিটি মূর্তি ফলককে যদি আমরা মনোসংযোগ সহযোগে গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করি তাহলে দেখতে পাবো যে প্রতিটি ফলকের যেমন শ্রেণি বিন্যাসগত দিক থেকে অনেক সাদৃশ্য রয়েছে তেমনি অনেক বৈশাদৃশ্যও রয়েছে। সামাজিক চিত্র বিষয়ক ফলকগুলি মন্দিরের ভিত্তিভূমির থেকে একটু ওপরের দিকের অংশে নতোন্নত বা Bas Relif এ এমনভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে যা দেখলেই আমরা সমকালীন সমাজজীবন সম্পর্কে এক সুস্পষ্ট ধারণা লাভ করতে পারি। আর মন্দিরের প্রবেশের অংশে যে পৌরাণিক ঘটনার দৃশ্য-ফলকগুলি রয়েছে সেগুলি দেখলে মনের মধ্যে আলাদা এক ভক্তির ভাব সঞ্চার হয়, মনে হয় জীবন্ত রূপে দেব-দেবীরা মন্দিরের এই স্থানে অবস্থান করে আছে। জীবন্তরূপে উপস্থাপিত এই নতোন্নত ভাস্কর্যগুলির মোটিফ সমকালীন শিল্পী কারিগরদের দক্ষতা, মানস কল্পনা এবং সর্বোপরি ভারতীয় শিল্প ঐতিহ্যের নান্দনিক সৌকর্যের সঙ্গে একাত্ম হয়ে গিয়ে মন্দিরগুলির শিল্পগুণ ও প্রাসঙ্গিকতাকে আরো বাড়িয়ে দিয়েছে। সমউচ্চতা বিশিষ্ট সমান্তরাল ও শ্রেণীবদ্ধ মূর্তির প্যানেলগুলি পৌরাণিক, সামাজিক এবং বিভিন্ন মোটিফযুক্ত। শিল্পকৃতির দিক থেকে এগুলি যথেষ্ট সাবলীল ও সৌষ্ঠবমণ্ডিত। এদের মধ্যে পারস্পরিক সামঞ্জস্যতা, ছন্দোময়তা ও গতিময়তা দর্শকদের মুগ্ধ করে। পরপর একই ধরনের ঘটনা চিত্রের ফলক বিশেষত পৌরাণিক আখ্যানের ফলক দেখে যাতে দর্শকদের চক্ষু ক্লান্ত হয়ে না পড়ে সেইজন্য দর্শকদের চক্ষুকে বিশ্রাম দেওয়ার জন্য তৎকালীন মন্দির নির্মাণকারী শিল্পীরা প্রতিটি ফলকের চারপাশ জুড়ে বিভিন্ন নকশা এবং উদ্ভিদজগকেন্দ্রিক বিভিন্ন ধরনের ফুল, লতা, পাতার মোটিফের বর্ড়ার দিয়েছেন, যা মন্দিরগুলির নান্দনিক মূল্যকে আরো বাড়িয়ে তুলেছে।

৭.৫. ফলকের চারধারের নকশা: উদ্ভিদজগৎকেন্দ্রিক এবং জ্যামিতিক নকশার বর্ডার দিয়ে বিভিন্ন আকারের টেরাকোটার ফলকগুলির চারধারে নকশা বা বর্ডার দেওয়া হয়েছে। ফলকগুলির বাইরের দিকের দুপাশ দিয়ে রৈখিক আকারে কোন জায়গায় দুটো আবার কোন জায়গায় তিনটে লাইন বিশিষ্ট ফুল, লতা, পাতা ও জ্যামিতিক নকশার মোটিফ দেখা যায়। আবার ভেতরের দিকে প্রতিস্থাপিত দেওয়াল গাত্রে যেসব ফলকগুলি রয়েছে সেইসব ফলকের মূর্তির চারধারেও উদ্ভিদজগৎকেন্দ্রিক নকশা ও জ্যামিতিক নকশার মোটিফ দেখা যায়। ভিত্তিভূমি বা Platfrom এর ওপর দাঁড়িয়ে থাকা মূলত যে সমাজচিত্রের ফলকগুলি থাকে তার চারধারে সাধারণত পদ্ম ও অন্যান্য ফুলের পাঁপড়ির মোটিফ দেখা যায়।

৭.৬. সৌন্দর্য বর্ধনে ফলকের নকশা ও বিন্যাস: বর্তমানে এই গ্রামের যে কটি মন্দিরে টেরাকোটার অলংকরণ রয়েছে তার বেশিরভাগটাই মন্দিরে প্রবেশের সন্মুখভাগের অংশ ও মন্দিরের দুই পার্শ্বের অংশ। এছাড়া ভিত্তিভূমির ওপরের অংশে পৌরাণিক, সামাজিক, ঐতিহাসিক এবং নানান মোটিফের দৃশ্য ফলকও দেখা যায়। লম্বা, সারিবদ্ধ ও রৈখিক আকারের প্যানেলে এইসব ফলকগুলিকে প্রতিস্থাপিত করা হয়েছে যা মন্দিরের শোভা বর্ধনে সহায়ক হয়ে

উঠেছে। মন্দিরগাত্রে প্রতিস্থাপিত এইসব ফলকগুলির চারধারে যে উদ্ভিদজগৎকেন্দ্রিক ও জ্যামিতিক নকশার মোটিফ রয়েছে তাও মন্দিরের শোভা বর্ধনে সহায়ক হয়ে উঠেছে। পরিতক্ত্য নবরত্ন মন্দিরের থাম বা Piller এর গায়ে ছোট বড়ো বিভিন্ন আকারের ফলকে যে পৌরাণিক আখ্যান, সমাজ চিত্র, যুদ্ধ যাত্রা ও বিভিন্ন ধরনের দৃশ্য ফলক প্রতিস্থাপন করা হয়েছে সেগুলি মন্দিরের শোভা বর্ধন করেছে। মন্দিরগুলিতে পৌরাণিক দেব-দেবীদের ফলকগুলিকে এমনভাবে প্রতিস্থাপন করা হয়েছে যে সেগুলি দেখে মনে হয় এই সমস্ত দেব-দেবীরা মন্দিরগাত্রে জীবন্ত রূপে অবস্থান করে রয়েছে।

৭.৭. ফলকগুলির বর্তমান অবস্থা: মন্দিরময় এই গ্রামের বেশিরভাগ মন্দির ও মন্দিরের অলংকরণগুলি যথার্থ সংরক্ষণ ও রক্ষণাবেক্ষণের অভাবে নষ্ট হয়ে গেছে বা প্রায় নষ্ট হয়ে যেতে বসেছে। বর্তমানে এই গ্রামের যে কটি মন্দিরের অলংকরণ অল্প বিস্তর রয়েছে তাও ভগ্ন বা অর্ধভগ্ন অবস্থায় রয়েছে। বেশিরভাগ ফলক নষ্ট হয়ে যাওয়া বা ভেঙে যাওয়ার ফলে সেটি যে কিসের ফলক ছিল তা চিহ্নিতকরণে অসুবিধা হয়ে যায়। মন্দিরের নিচের অংশের ফলকগুলির বেশিরভাগটাই নষ্ট হয়ে গেছে। কোন কোন ফলকের ওপরের অংশ অর্থাৎ মাথার দিকটা নেই আবার কোন কোন ফলকের নিচের অংশর অর্থাৎ পায়ের দিকটা নেই। আবার কিছু ফলকের মাঝ বরাবর ফাটল ধরে গিয়ে মাঝের অংশটা ঝরে বা খুলে পড়ে গেছে। এছাড়া অনেক ফলক চুরি হয়ে যাওয়া বা ভেঙ্গে যাওয়ার ফলে ফলকটি যে স্থানে প্রতিস্থাপিত হয়েছিল সেই স্থানটা ফাঁকাই থেকে গেছে (দ্রষ্টব্য চিত্র নং- ২১ ও ২২)।

চিত্র নং- ২১ ভগ্ন টেরাকোটার ফলক

চিত্র নং- ২২ ভগ্ন টেরাকোটার ফলক

৮. অলংকরণের বিষয় ও মোটিফ: বর্তমানে পশ্চিম মেদিনীপুরের পাথরা গ্রামে যে কটি মন্দিরে টেরাকোটা ও সামাণ্য পরিমাণে পঙ্খের অলংকরণ রয়েছে তারও বেশির ভাগটাই নষ্ট হয়ে যেতে বসেছে। যদিও কলকাতা মণ্ডলের পুরাতাত্ত্বিক সর্বেক্ষণ বিভাগের প্রচেষ্টায় কয়েকটি মন্দির নতুন করে সংস্কার করে সংরক্ষণ করা হয়েছে। আমাদের আলোচনার সুবিধার্থে এই গ্রামের টেরাকোটা মন্দিরের অলংকরণকে কয়েকটি বিষয় অনুসারে ভাগ করে নিম্নে আলোচনা করা হল:

৮.১. পৌরাণিক আখ্যান: বাংলা তথা রাঢ় বাংলায় এমন কোন টেরাকোটার মন্দির নেই যেখানে পৌরাণিক আখ্যানের কোন চিত্র নেই। 'মন্দিরময় পাথরা'ও এক্ষেত্রে ব্যাতিক্রম নয়। পাথরা গ্রামে যে কটি টেরাকোটার অলংকরণযুক্ত মন্দির রয়েছে সব কটি মন্দিরেই আমরা পৌরাণিক আখ্যানের দৃশ্য-ফলক দেখতে পাই। কংসাবতীর নদীর ধার ঘেঁষে পরিত্যক্ত নবরত্ন রীতির মন্দিরের উত্তর দিকের পিলারে রয়েছে কৃষ্ণলীলার নানান দৃশ্য যেমন- কৃষ্ণের বস্ত্রহরণ, কদম্ব বৃক্ষ তলে গোপিকা সহ রাধা কৃষ্ণ, রাধা কৃষ্ণের যুগল মূর্তি, কৃষ্ণের বকাসুর বধ, ননী চুরি, কৃষ্ণ-

বলরাম ইত্যাদি। এছাড়া মন্দিরের প্রবেশের দুই পার্শ্বের অংশে দশাবতারের মধ্যে কয়েকটি অবতারের ফলক, কৃষ্ণলীলার কয়েকটি ফলক এবং পৌরাণিক দেব-দেবীদের কয়েকটি ভগ্ন ফলক দেখা যায়। কালাচাঁদের দালানের পশ্চিমদিকে যে তিনটি চারচালা রীতির শিব মন্দির এবং পূর্বদিকে যে একটি আটচালা রীতির শিব মন্দির রয়েছে সেখানে পৌরাণিক কাহিনির মধ্যে ভগ্ন টেরাকোটার ফলকে রয়েছে; দশাবতারের মধ্যে নৃসিংহ, রাম, মৎস্য, বরাহ ইত্যাদি অবতার, বাকিগুলি ভেঙ্গে গেছে। দশমহাবিদ্যার মধ্যে রয়েছে— কালী, তারা, কমলা প্রমুখরা এবং বাকীগুলির অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়া যায় না। কৃষ্ণলীলা বিষয়ক কয়েকটি ফলক রয়েছে যেমন—রাধা কৃষ্ণ, কৃষ্ণের ষড়ভূজ মূর্তি, নৌকাবিলাস ইত্যাদি। এইসব মন্দিরগুলিতে পৌরাণিক দেব-দেবীদের মধ্যে স্থান করে নিয়েছে—ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর, শিব, পার্বতী, কালী, নারায়ণ প্রমুখরা। পঞ্চ শিব মন্দিরে শুধুমাত্র মূল মন্দিরে প্রবেশের সম্মুখভাগে ভগ্ন টেরাকোটা ফলকে কয়েকটি পৌরাণিক দেব-দেবীর দৃশ্য ফলক রয়েছে, এঁরা হলেন—কার্ত্তিক, গণেশ, শিব, মহিষাসুর, রাম, লক্ষণ প্রমুখ। বন্দ্যোপাধ্যায়দের পূর্বমুখী তিনটে পঞ্চরত্ন রীতির মন্দিরের সম্মুখভাগ ও দুই পার্শ্বের প্যানেলগুলিতে রয়েছে—কৃষ্ণের ষড়ভূজ মূর্তি, চৈতন্য, বলরাম, দশাবতারের কূর্ম, মৎস্য, বরাহ প্রমুখ অবতার। দুর্গা, কালী, শিব, ব্রহ্মা, বিষ্ণু, বিশ্বকর্মা, জগধাত্রী ইত্যাদি পৌরাণিক দেব-দেবী। কৃষ্ণের লীলার মধ্যে রয়েছে কৃষ্ণের জন্ম থেকে যৌবনের নানা লীলা কাহিনির দৃশ্য। রামায়ণের কাহিনির মধ্যে রয়েছে রাম লক্ষণ সহ রাবণ ও হনুমান আর রাক্ষস সেনার যুদ্ধ, রামের লঙ্কাযুদ্ধ জয় করে এসে পুনরায় সীতা ও লক্ষণ সহ অয্যোধ্যার সিংহাসনে বসার চিত্র, অশোক বনে বন্দিনী সীতা রামের জন্য অপেক্ষায় বসে আছেন তারও দৃশ্য-ফলক রয়েছে এই মন্দিরগুলিতে (দ্রষ্টব্য চিত্র নং- ২৩, ২৪ ও ২৫)।

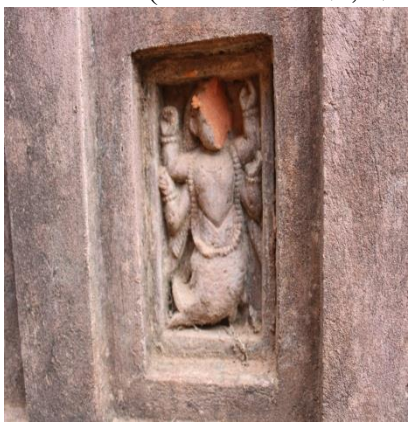

চিত্র নং- ২৩ টেরাকোটার ফলকে মৎস্য অবতার

চিত্র নং- ২৪ টেরাকোটার ফলকে কূর্ম অবতার

চিত্র নং- ২৫ টেরাকোটার ফলকে নারায়ণ

৮.২. সমাজচিত্র: বাংলার মন্দির নির্মাণকারী শিল্পী কারিগরেরা বাংলার যে সমস্ত অঞ্চলে মন্দির নির্মাণ করতে গেছে সেই সমস্ত অঞ্চলের সমাজ জীবনের বিবিধ চিত্র সেই সমস্ত অঞ্চলের মন্দিরে প্রতিস্থাপিত করেছে। এক্ষেত্রে পাথরার টেরাকোটা মন্দির স্থাপত্য ব্যাতিক্রম নয়। মন্দিরময় এই গ্রামের টেরাকোটা মন্দির স্থাপত্যে তৎকালীন সমাজজীবনের নানান দৃশ্য উপস্থাপিত হয়েছে। পূর্বেই আমরা আলোচনা করেছি যে এই সামাজিক চিত্র মন্দিরের ভিত্তি প্রস্তরের উপরের অংশে অর্থাৎ মন্দিরের নিচের দিকে প্যানেলে বা মূল মন্দিরের প্রবেশের দুই পার্শ্বে বা কোনার দিকের ফলকে প্রতিস্থাপিত হয়। আবার কোন কোন মন্দিরে থাম বা Piller এর নিচের দিকের অংশের ছোট ছোট চ্যাপ্টা আকারের চৌকোনা ফলকে এই সমাজচিত্রগুলিকে প্রতিস্থাপিত হতে দেখা যায়। মন্দির গাত্রে অবস্থিত এই চিত্রগুলির অবস্থান যেহেতু বেশিরভাগটাই নিচের দিকে অবস্থিত, তাই রোদ জলে, প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে অনেক ফলক নষ্ট হয়ে গেছে বা নষ্ট হয়ে যেতে বসেছে। এর ফলে অনেক ফলক চিহ্নিতকরণে অসুবিধার সম্মুখীন

হতে হয়। পরিতক্ত্য নবরত্ন মন্দিরের নিচের অংশে এবং মন্দিরের সম্মুখভাগের কোনার অংশে যে সমস্ত সমাজচিত্রগুলি রয়েছে সেগুলি হল— শিকার দৃশ্য, মহিলাদের নৃত্য গীত পরিবেশনের দৃশ্য, বাচ্চা কোলে রমণী, রন্ধনরতা রমণী, যুদ্ধ যাত্রার দৃশ্য ইত্যাদি। পাথরা গ্রামের পরিতক্ত্য নবরত্ন রীতির মন্দিরটি বাদ দিয়ে প্রায় মন্দিরে মূল মন্দিরে প্রবেশের দুই পার্শ্বে বড়ো আকারের টেরাকোটার ফলকে দ্বারপালের ফলক দেখা যায়। এ প্রসঙ্গে উল্লেখ্য যে শুধুমাত্র রাসমঞ্চে দ্বারপালের বদলে দ্বারপালিকার ফলক রয়েছে। রাসমঞ্চে যেহুতু রাধা কৃষ্ণের রাসলীলা অনুষ্ঠিত হতো তাই রাসমঞ্চে দ্বারপালের বদলে দ্বারপালিকা বা গোপিকাদের ফলক দেখা যায়। চারচালা রীতির শিব মন্দিরগুলি এবং পঞ্চশিব মন্দিরে সমাজ চিত্রের ফলক সেভাবে খুঁজে পাওয়া যায় না। পঞ্চশিব মন্দিরের পেছনের দেওয়ালে একটি মাত্র বড়ো আকারের ত্রিকোণা ফলকে বাতায়ণবর্তিনী রমণীর ফলক দেখা যায়। বন্দ্যোপাধ্যায়দের তিনটি পঞ্চরত্ন রীতির শিব মদিরেও নানান সমাজচিত্রের ফলক দেখা যায়। চারচালা রীতির শিব মন্দিরগুলি এবং পঞ্চশিব মন্দিরে সমাজ চিত্রের ফলক সেভাবে খুঁজে পাওয়া যায় না। বন্দ্যোপাধ্যায়দের তিনটি পঞ্চরত্ন রীতির শিব মন্দিরে সমাজচিত্রের মধ্যে রয়েছে—শিকার যাত্রা, একজন পুরুষের সিদ্ধি তৈরির দৃশ্য, হুঁকো সেবনের দৃশ্য, বাচ্চা কোলে রমণী, রন্ধণরতা রমণী, মাছ কাটছে একজন স্ত্রীলোক ইত্যাদি (দ্রষ্টব্য চিত্র নং- ২৬, ২৭ ও ২৮)।

চিত্র নং- ২৬ টেরাকোটার ফলকে দ্বারপাল

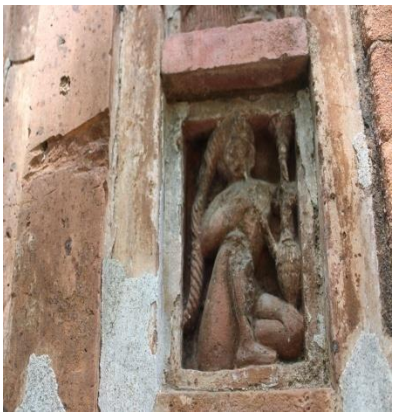

চিত্র নং ২৭- হুঁকো সেবনরত পুরুষ

চিত্র নং- ২৮ বাতায়নবর্তিনী

৮.৩. বিভিন্ন প্রকার মোটিফ: মন্দিরময় এই গ্রামের যে কটি মন্দিরে বর্তমানে টেরাকোটার অলংকরণ দেখা যায় তার সব কটিতেই বিভিন্ন আকারের ছোট বড়ো ফলকে বা ফলকের চারপাশের নকশাই আমরা নানান ধরনের মোটিফ দেখতে পাই। এখানকার টেরাকোটা মন্দিরে প্রাণীজগৎকেন্দ্রিক মোটিফের মধ্যে স্থান করে নিয়েছে— হংসলতা, ময়ূর, টিয়া পাখি, ষাঁড়, গরু, সিংহ, হাতি, ঘোড়া, হনুমান, পেঁচা, মাছ ইত্যাদি। উদ্ভিৎজগৎকেন্দ্রিক মোটিফের মধ্যে রয়েছে— সর্পিলগতি লতা, বৃক্ষলতা, কাণ্ড ও টবসহ ফুল গাছ, পদ্ম ও পদ্মের কুঁড়ি, জীবনবৃক্ষ, কলকা, লতা, পাতা ইত্যাদি। জ্যামিতিক নকশাকেন্দ্রিক মোটিফগুলি হল—ত্রিভূজ, চতুর্ভূজ, আয়তক্ষেত্র, বর্গক্ষত্রে, ষড়ভূজ, বৃত্ত, অর্ধবৃত্ত ইত্যাদি। আর বিবিধ মোটিফের মধ্যে রয়েছে— রথ, ধানের শিষ, লক্ষীর পদচিহ্ন, নৌকা, মঙ্গল ঘট, সিংহাসন ইত্যাদি, এছাড়াও রয়েছে পঙ্খের অলংকরণে নানান ধরণের মোটিফ।

পাথরার মন্দিরগুলিতে মন্দিরের ওপরের অংশে পৌরাণিক ঘটনার ফাঁকে ফাঁকে বা মন্দিরের নিম্নাংশে সামাজিক ঘটনার পাশে সাধারণত চ্যাপ্টা চৌকোণা ও লম্বা তিনকোণা আকারের ফলকে উদ্ভিদজগৎকেন্দ্রিক বা জ্যামিতিক নকশাকেন্দ্রিক মোটিফগুলি ব্যবহৃত হয়েছে। এছাড়া মন্দিরের দুই পার্শ্বে একটি মাত্র চৌকোণা চ্যাপ্টা আকারের ফলকে পদ্ম ও পদ্মের কুঁড়ির মোটিফ ব্যাবহৃত হতে দেখা গেছে। আবার লম্বা চৌকোণা আকারের ফলকে

ফুল লতা পাতার মোটিফ ব্যবহৃত হয়েছে। এছাড়া সারিবদ্ধভাবে যে পৌরাণিক ও সামাজিক ঘটনা চিত্রের ফলকের চারধারে জ্যামিতিক নকশা ও উদ্ভিদজগৎকেন্দ্রিক মোটিফগুলির বর্ডার দেওয়া হয়েছে। আর প্রাণীজগৎকেন্দ্রিক মোটিফগুলি বিভিন্ন পৌরাণিক চরিত্র এবং সমাজচিত্রের মাঝে পাওয়া গেছে, যেমন— কার্ত্তিকের সঙ্গে ময়ূর, শিবের সঙ্গে ষাঁড়, দুর্গার সঙ্গে সিংহ ইত্যাদি (দ্রষ্টব্য চিত্র নং- ২৯, ৩০, ৩১ ও ৩২)।

চিত্র নং- ২৯ কলকার মোটিফ

চিত্র নং- ৩০ ফুলের মোটিফ

চিত্র নং- ৩১ জ্যামিতিক নকশার মোটিফ

চিত্র নং- ৩২ পঙ্খের অলংকরণ

৯. মন্দির নির্মাণকারী শিল্পীদের পরিচয়: পশ্চিম মেদিনীপুরের দাসপুরের মিস্ত্রিরা এই গ্রামের মন্দিরগুলি নির্মাণ করেছিলেন। এখানকার একটি মন্দিরের দেওয়ালে দেখা যায় দাশপুরের বাসুদেবপুরের একজন মিস্ত্রির নাম খোদিত রয়েছে। এখানকার মন্দির নির্মাণকারী শিল্পীদের পশ্চিম মেদিনীপুরের ঘাটাল, চন্দ্রকোণা এইসব অঞ্চল থেকে পাথরা গ্রামের জমিদাররা মন্দির নির্মাণের জন্য এনেছিলেন। কারণ এই অঞ্চলের মন্দির নির্মাণকারী কারিগরেরা মন্দির নির্মাণের কাজে খুব পারদর্শী ছিল। শুধু পাথরা বলে নয় বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলের মন্দির নির্মাণ কার্যের জন্য এই অঞ্চল থেকে মন্দির নির্মাণকারী এই সূত্রধর শ্রেণির শিল্পীদের নিয়ে যাওয়া হতো। বিষ্ণুপুর, বর্ধমান, বীরভূম, অম্বিকা-কালনা প্রভৃতি স্থানের মন্দির নির্মাণ কার্যে এই অঞ্চলের মন্দির নির্মাণকারী মিস্ত্রি বা সূত্রধরেরা জড়িত ছিলেন বলে জানা যায়। কিন্তু বর্তমানে পুরাতাত্ত্বিক সর্বেক্ষণ বিভাগ যেসব মিস্ত্রিদের প্রশিক্ষণ দিয়ে মন্দির সংরক্ষণ করাচ্ছে তারা বেশিরভাগই মুর্শিদাবাদের বাসিন্দা এবং এদের সাথে রয়েছে বাঁকুড়ার বিষ্ণুপুরের কিছু কারিগর। এছাড়া স্থানীয় শ্রমিকদেরকেও পুরাতাত্ত্বিক সর্বেক্ষণ বিভাগ প্রশিক্ষণ দিয়েছে যে কীভাবে বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতিতে চুন, সুরকি ও মশলাকে পচীয়ে মন্দির সংরক্ষণের কাজে ব্যবহার করা হয়।

১০. স্বকীয়তা: মন্দিরের গঠন রীতি, অলংকরণ শৈলী, মোটিফ বা নকশা ইত্যাদি সব দিক থেকেই এখানকার মন্দিরগুলি সত্যিই বাংলার টেরাকোটা মন্দির স্থাপত্যের বিচারে এক উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করে। এবার নিম্নে আমরা মন্দিরময় পাথরার টেরাকোটা মন্দির স্থাপত্যের স্বকীয়তাগুলি নিয়ে আলোচনা করবো:

প্রথমত: এই গ্রামে চালা, রত্ন, মঞ্চ, দালান ও দেউল রীতির মন্দির দেখা যায়। একটা ছোট্ট গ্রামে এতগুলি মন্দিরের অস্তিত্ব সত্যিই প্রশংসার দাবী রাখে।

দ্বিতীয়ত: টেরাকোটা অলংকরণের মাঝে মাঝে অল্প বিস্তর পঙ্খের অলংকরণও দেখা যায়।

তৃতীয়ত: এখানে টেরাকোটা মন্দিরের সঙ্গে সঙ্গে ইঁটের মন্দিরও রয়েছে যেগুলিতে টেরাকোটার কোন অলংকরণ নেই।

চতুর্থত: পাথরা গ্রামের নবরত্ন রীতির একটি মন্দিরে বর্জ্যপাত হওয়ায় মন্দিরটি অভিশপ্ত হয়ে যায়। সেই মন্দিরে কোনদিনই কোন দেবতার বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা হয় নি। সেটি আজও পরিত্যক্ত নবরত্ন মন্দির হিসাবেই থেকে গেছে।

পঞ্চমত: এখানকার মন্দিরগুলিতে দ্বারপালের সঙ্গে দ্বারপালিকাকেও দেখা যায়।

ষষ্ঠত্ব: এখানকার রাসমঞ্চের গঠন রীতি সত্যিই অভিনব। এটি অষ্টকোণাকৃতি এবং এর চূড়াটি ওল্টানো পদ্মের মতো।

সপ্তমত: এই গ্রামে রত্ন ও চালা মন্দিরের সংখ্যাই বেশি অন্যান্য রীতির মন্দিরের তুলনায়।

অষ্টমত: মহাভারতের কোনো কাহিনি চিত্র এখানকার মন্দিরের স্থাপত্যের অলংকরণে দেখা যায় না।

নবমত: এই গ্রামের টেরাকোটা মন্দিরগুলির অলংকরণে ছোট বড়ো নানা প্রকারের প্রচুর পদ্মের মোটিফ দেখা যায়।

১১. সংরক্ষণ ও রক্ষণাবেক্ষণ: পাথরা গ্রামের মন্দিরগুলি সংরক্ষণের জন্য সর্বপ্রথম ইয়াসিন পাঠানের নেতৃত্বে ১৯৯১ সালের ২৯ অক্টোবর বিন্দা পাথরার বিবেকানন্দ ক্লাবে পাথরা ও পার্শ্ববর্তী গ্রামের হিন্দু মুসলিম নির্বিশেষে সব মানুষেরা একত্রিত হয়। শহর মেদিনীপুর থেকে বিদদ্ধজনেরা আসেন এই গ্রামে এবং পাথরার মন্দিরগুলি সংরক্ষণ করার জন্য একটি কমিটি গঠিত হয়। প্রথমে এই কমিটির নামকরণ করা হয় 'পাথরা মন্দির রক্ষা কমিটি', পরবর্তীকালে এই কমিটির নাম বদল করে রাখা হয়—'পাথরা পুরাতত্ব সংরক্ষণ কমিটি'। এরপর এই কমিটির নিবন্ধীকরণ করা হয় এবং মন্দিরগুলি সংরক্ষণের জন্য আন্দোলন শুরু হয়। ১৯৯১ সালে মন্দির সংরক্ষণের জন্য কমিটি তৈরি হওয়ার পর এই আন্দোলন একেবারে পুরোদমে শুরু হয়। ১৯৯২ সালের ৫ডিসেম্বর বিভিন্ন গুণীজনের পরামর্শে এবং 'পাথরা মন্দির সংরক্ষণ' কমিটির সহায়তায় সদর মেদিনীপুরের বিভিন্ন বুদ্ধিজিবী, লেখক, কবি, প্রচার মাধ্যমের লোকজন, বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয় ও মেদিনীপুর কলেজের ইতিহাস বিভাগের বিভিন্ন অধ্যাপকরা, জেলা শাসকদের নিয়ে পাথরার মন্দিরগুলি পরিদর্শনের জন্য একটি কমিটি তৈরি করা হয়। এই পরিদর্শন দলের পরিদর্শনের পর সরকারের সরাসরি নজরে আসে পাথরা গ্রামের মন্দির স্থাপত্যগুলি এবং প্রচার মাধ্যমের সুবাদে পাথরার মন্দিরগুলি জন সমক্ষে প্রচারের আলোতে আসে। ইয়াসিন পাঠানের সহায়তায় ১৯৯২ সালের ৫ ডিসেম্বর আনুষ্ঠানিকভাবে পাথরা গ্রামের মন্দিরগুলি সংরক্ষণের যে সূচনা হয় আর ওই বছরই ৬ ডিসেম্বর বাবরি মজজিদ ধ্বংস হয়। এরপর ১৯৯৪ সালে যখন প্রণব মুখোপাধ্যায় মেদিনীপুরে আসেন তখন তিনি যোজনা কমিশনের প্রধান। সেই সময় প্রণব বাবুর কাছে পাথরার মন্দিরগুলি সংরক্ষণের জন্য আবেদন করা হয়। তিনি এই আবেদনে সাড়া দেন। তারপর I I T খড়গপুরের সহায়তায় পাথরা গ্রাম এবং এখানকার মন্দিরগুলি নিয়ে একটা ২০ লক্ষ টাকার প্রকল্প তৈরি করে যোজনা কমিশনের দপ্তরে জমা দেওয়া হয়। যোজনা ভবন থেকে এই ২০ লক্ষ টাকার অনুমোদনও দেওয়া হয় এই গ্রামের মন্দিরগুলিকে সংরক্ষণ করার জন্য। এরপর এই টাকা জেলাশাসকের দপ্তরে আসে। নির্দিষ্ট কাজে ব্যায় না হওয়ার ফলে সেই টাকা দীর্ঘদিন জেলা শাসকের দপ্তরে পড়ে থাকার পর আবার দিল্লী ফেরৎ চলে যায়। এরপর 'পাথরা পুরাতত্ব সংরক্ষণ কমিটির' দীর্ঘদিনের প্রয়াসের ফলে ১৯৯৮ সালে পুরাতাত্ত্বিক

সর্বেক্ষণ বিভাগকে দিয়ে যোজনা কমিশন দ্বারা অনুমোদিত টাকায় মন্দির সংরক্ষণের কাজ শুরু হয়। এই সুবাদে পাথরা মন্দির সংরক্ষণ কমিটির সাথে পুরাতাত্ত্বিক সর্বেক্ষণ বিভাগের একটা যোগাযোগ তৈরি হয়। এ প্রসঙ্গে উল্লেখ্য ২০০০ সালে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যখন কেন্দ্রীয় রেলমন্ত্রী ছিলেন সেইসময় শ্রীমতি বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে পাথরার মন্দির সংরক্ষণের জন্য একটা আবেদন পত্র পাঠানো হয়। তিনি সেই আবেদন পত্রটি কেন্দ্রীয় তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরে পাঠিয়ে দেন। তখন কেন্দ্রীয় তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের জয়েন্ট সেক্রেটারি ছিলেন কস্তুরী গুপ্তা মেনু, এই কস্তুরী গুপ্তা মেনুর সহায়তায় এই আবেদন পত্রটি মঞ্জুর হয়। ২০০০ সালে কেন্দ্রীয় তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের অধীনে কেন্দ্র পুরাতাত্ত্বিক সর্বেক্ষণ বিভাগের ডায়রেক্টর জেনারেল ছিলেন গৌরী চ্যাটার্জী। এরপর ২০০৩ সালের ১৬ ডিসেম্বর পুরাতাত্ত্বিক সর্বেক্ষণ বিভাগ পাথরা গ্রামের মন্দিরগুলি সংরক্ষণের জন্য রাষ্ট্রপতির অনুমতি পত্র পান। এরপর মন্দিরগুলি সংরক্ষণের কাজ শুরু হয়। পুরাতাত্ত্বিক সর্বেক্ষণ বিভাগ এই গ্রামের ৩৪টি মন্দিরের মধ্যে ২৯টি মন্দিরকে তাদের আওতায় নিয়ে নেয়, বাকী পাঁচটি মন্দিরকে পরবর্তী কালে সংস্করণ করবে বলে ঠিক করে। এই মন্দিরগুলি সংলগ্ন ২৫ বিঘা জমি চাষীদের কাছ থেকে পুরাতাত্ত্বিক সংরক্ষণ বিভাগ কিনবে বলে নিজেদের দখলে নিয়ে নেয়। এখনও পর্যন্ত ১৯টি মন্দির সংরক্ষণ করা হয়েছে। জমি সংক্রান্ত ব্যাপারে রাজ্য সরকারের সঙ্গে পুরাতাত্ত্বিক সংরক্ষণ বিভাগের কিছু সমস্যা দেখা দিলে তিন চার বছর যাবৎ এই সংরক্ষণের কাজ থেমে গেছে বলে জানান স্থানীয় গবেষক ইয়াসিন পাঠান (পাঠান, ইয়াসিন, ব্যাক্তিগত সাক্ষাৎকার, ২৫এপ্রিল, ২০১৭)।

১২. মন্দিরগুলির বর্তমান অবস্থা: বর্তমানে এখানকার মন্দিরগুলি খুবই খারাপ অবস্থায় রয়েছে। জমি অধিগ্রহণ নিয়ে কিছু সমস্যা থাকায় বর্তমানে সংস্কার ও সংরক্ষণের কাজ থমকে আছে। এর ফলে এই গ্রামের বাকি মন্দিরগুলি অনাদরে খুবই অবহেলিত অবস্থায় পড়ে রয়েছে। পুরাতাত্ত্বিক সর্বেক্ষণ বিভাগ যদি মন্দিরগুলিকে সংস্কার করে সংরক্ষণ করেতে পারত তবে বর্তমানে মন্দিরগুলি বিষ্ণুপুর, অম্বিকা-কলনা ইত্যাদি জায়গার মতো দেশীয় ঐতিহ্য হিসাবে বিবেচিত হতো এবং পুরাতাত্ত্বিক পর্যটন কেন্দ্র হিসাবে বিশ্বের মানচিত্রে স্থান করে নিত। এ প্রসঙ্গে স্থানীয় অধিবাসীরা জানিয়েছেন যে তারা ৪৫ বছর ধরে এই বিষয়টি নিয়ে লড়াই করে যাচ্ছেন। রাজ্য সরকারের অনীহা প্রকাশ এবং উদাসীন্যের জন্য পাথরার মন্দিরগুলির সঠিকভাবে সংরক্ষণ ও রক্ষণাবেক্ষণ হচ্ছে না। এলাকাবাসীরা মন্দিরগুলি সংরক্ষণ করার জন্য ইয়াসিন পাঠানের নেতৃত্বে বিভিন্ন সরকারী ও বেসরকারী দপ্তরে আবেদন জানিয়েই চলেছে কিন্তু সেভাবে কোন প্রত্যুত্তর এখনও আসছে না।

ক্ষেত্রসমীক্ষার জানা যায় এলাকাবাসীর আবেদন ও অনুরোধে স্থানীয় প্রশাসন ও জেলাশাসকের দপ্তর থেকে বেশ কয়েকবার মন্দিরময় এই গ্রামের এই মন্দিরগুলি সংস্কার ও সংরক্ষণের জন্য সংশ্লিষ্ট দপ্তরে আবেদন পত্র পাঠানো হয়েছে। ২০১৬ সালের ডিসেম্বর মাসে জেলা শাসকের মারফৎ রাজ্য পর্যটন দপ্তরেও একটা আবেদন পত্র পাঠানো হয়েছে। যেহেতু মন্দির সংলগ্ন এই জমিগুলো চাষযোগ্য নয় তাই চাষীরাও চাইছে এই জমিগুলি যাতে মন্দির সংরক্ষণের জন্য পুরাতাত্ত্বিক সর্বেক্ষণ বিভাগ নায্য মূল্য দিয়ে তাদের কাছ থেকে কিনে নেয়। (ইয়াসিন পাঠান, ব্যাক্তিগত সাক্ষাতকার, এপ্রিল ২৫, ২০১৭)।

১৩. স্থানীয় প্রশাসনের উদ্যোগ গ্রহণ: স্থানীয় প্রশাসন অর্থাৎ পঞ্চায়েত, ব্লক অফিস, জেলা প্রশাসন প্রভৃতি থেকে সেভাবে কোনো উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়নি পাথরার মন্দিরগুলি সংরক্ষণের জন্য। স্থানীয় প্রশাসনের কাছে এলাকাবাসীরা আবেদন করেছিল যাতে মন্দিরগুলির আসেপাশে পর্যটকদের জন্য একটু বিশ্রাম করার জায়গা, পানীয় জল, শৌচালয় প্রভৃতির বন্দোবস্তো করা কিন্তু স্থানীয় প্রশাসন এ ব্যাপারে আজ অব্দি কোনো উদ্যোগ গ্রহণ করেনি। এ ব্যাপারে সর্বপ্রথম পাথরা গ্রাম পঞ্চায়েত ১৯৯১ সালে ৩ হাজার টাকা দেয় মন্দিরগুলি সংলগ্ন বন জঙ্গল ও আগাছা পরিস্কারের জন্য। আজ পর্যন্ত স্থানীয় প্রশাসনের আর্থিক সহায়তা বলতেই এটাই আর কোন আর্থিক সহায়তা পাওয়া যায় নি। এ ব্যাপারে 'পাথরা পুরাতত্ত্ব সংরক্ষণ কমিটি'র কর্নধর ইয়াসিন পাঠান বলেছেন- পাথরা গ্রামে পাথরা মন্দির সংরক্ষণের জন্য যে কমিটি রয়েছে অর্থাৎ পাথরা পুরাতত্ত্ব সংরক্ষণ কমিটিও এ ব্যাপারে কোন

আর্থিক সহায়তা স্থানীয় প্রশাসন বা সরকারের পক্ষ থেকে পায়নি। তাঁরা বিভিন্ন সরকারী দপ্তরে যাওয়া ও চিঠি পত্র পাঠানোর জন্য বিভিন্ন ব্যাক্তির কাছ থেকে আর্থিক সহায়তা নিয়ে থাকে (ইয়াসিন পাঠান, সাক্ষাতকার, এপ্রিল ২৫, ২০১৭)।

১৪. পাথরার মন্দির স্থাপত্য ও পর্যটন: সংবাদপত্র, ইন্টারনেট, ফেসবুক প্রভৃতির মাধ্যমে জনতে পেরে বিভিন্ন দেশী বিদেশী পর্যটক, পুরাতাত্ত্বিক, ঐতিসাহিকেরা পাথরা গ্রামে শতাধিক প্রাচীন মন্দিরগুলি দেখার উদ্দেশে আসছে। কিন্তু মন্দিরগুলির এই দশা দেখে তারা হতাশা আর মন খারাপ নিয়ে ফিরে যাচ্ছে। স্থানীয় মানুষেরা মনে প্রাণে চাইছে এবং আপ্রাণ চেষ্টা করছে মন্দির ঘেরা এই ছোট্ট গ্রামটি একটি ঐতিহাসিক এবং পুরাতাত্ত্বিক পর্যটন কেন্দ্র হিসাবে গড়ে উঠুক এবং জাতীয় হেরিটেজ সাইটের মর্যাদা পাক এবং বিশ্বের মানচিত্রে পর্যটন কেন্দ্র হিসাবে স্থান করে নিক। বিদেশ থেকে আগত পর্যটকরা পাথরা পুরাতত্ত্ব কমিটির সঙ্গে যোগাযোগ করে দোভাষী নিয়ে এখানে আসে। এছাড়া বিভিন্ন ট্রাভেল এজেন্ট বা প্রচার মাধ্যমের সূত্র ধরে শতাধিক প্রাচীন এই মন্দিরগুলি দেখতে আসে। সংস্কারের অভাবে ধুঁকছে এই প্রাচীন ভগ্ন জীর্ণ মন্দিরগুলি দেখে তারা আশাহত হয়ে আবার ফিরে যায়। ১৯৭০ সালে ডেভিড জে. ম্যাককাচ্চন পাথরা গ্রামে আসেন এবং এই গ্রামের মন্দির স্থাপত্য নিয়ে কাজ করেন। এছাড়া এই গ্রামের মন্দির স্থাপত্য দেখতে এবং কাজ করতে এসেছেন নানান বিগদ্ধ পুরাতাত্ত্বিক ও ঐতিহাসিক, এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন— অমিয় বন্দ্যোপাধ্যায়, তারাপদ সাঁতরা, হিতেশ রঞ্জন সান্যাল, প্রণব রায় প্রমুখ।

১৫. উপসংহার: শহর মেদিনীপুর থেকে মাত্র ২০ কিলোমিটার দূরে কাঁসাই নদীর তীরবর্তী মন্দির ঘেরা এই গ্রামটি সত্যিই পর্যটক, পুরাতত্ত্বপ্রেমী ও ঐতিহাসিকদের কাছে আকর্ষণীয়। সেই ষোড়শ সপ্তদশ শতকে গড়ে ওঠা এইসব প্রাচীন মন্দিরগুলি যুগ যুগ ধরে ইতিহাসের সাক্ষী বহন করে নিয়ে চলেছে। এতটুকু একটা গ্রামে চালা, রত্ন, দালান, দেউল, মঞ্চ প্রভৃতি এত ধরনের মন্দির গড়ে উঠেছে—যা সত্যিই অভূতপূর্ব। এছাড়া মন্দিরগুলির গায়ে পৌরাণিক, সামাজিক এবং নানান ধরনের টেরাকোটার অলংকরণ প্রতিস্থাপন করা হয়েছে যা মন্দিরগুলির নান্দনিক গুরুত্বকে আরো শত গুণ বাড়িয়ে তুলেছে। মন্দির সম্পর্কিত যে সব জনশ্রুতি রয়েছে মন্দির প্রাঙ্গনে সেগুলি যখন আমরা স্থানীয় মানুষদের কাছ থেকে শুনি তখন মন্দিরগুলি আমাদের সামনে জীবন্তরূপে উদ্ভাসিত হয়। স্থানীয় গবেষক ইয়াসিন পাঠান আজ থেকে ৪০-৫০ বছর ধরে পাথরা গ্রামের এইসব পুরাকীর্তির অমূল্য সম্পদগুলি সরক্ষণ করার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন। বর্তমানে পাথরা গ্রামের অবশিষ্ট ৩৪ টি মন্দির খুবই অবহেলিত অবস্থায় রয়েছে— যা ধ্বংসের দিকে আস্তে আস্তে এগিয়ে যাচ্ছে। ইয়াসিন পাঠান এবং পাথরা পুরাতত্ত্ব সংরক্ষণ কমিটির এই দীর্ঘদিনের লড়াই এবং প্রচেষ্টার ফলে ১৯টি মন্দিরের সংস্কার করে সংরক্ষণ করেছে পুরাতত্ত্ব সংরক্ষণ বিভাগের কলকাতা মণ্ডল। কিন্তু বিভিন্ন সমস্যার ফলে বাকি মন্দিরগুলির সংরক্ষণের কাজ থমকে গেছে। স্থানীয় মানুষ ও স্থানীয় প্রশাসনের সহায়তায় এই সমস্যার অবসান ঘটিয়ে সংরক্ষণের কাজ শুরু হলে ধ্বংশের হাত থেকে শতাধিক প্রাচীন এই মন্দিরগুলিকে বাঁচানো সম্ভব হবে এবং পাথরা গ্রামও পর্যটনের মানচিত্রে নিজেদের জায়গা করে নিতে পারবে।

সহায়ক গ্রন্থপঞ্জী:

1. পাঠান, ইয়াসিন, মন্দিরময় পাথরা'র ইতিবৃত্ত (তৃতীয় সংস্করণ), মেদিনীপুর: অমিত প্রকাশন, ২০১৩।
2. মণ্ডলসুজয়কুমার , ও তনয়া মুখার্জ্জী, মলুটীর মন্দির টেরাকোটা, সিউড়ী, বীরভূম: রাঢ় প্রকাশনা, ২০১৫।
3. মুখোপাধ্যায় ,বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ :কলকাতা ,টেরাকোটা-পশ্চিমবঙ্গের মন্দির ,বিনোদবিহারী ও অন্যান্য , ।১৪১৫
4. মুখোপাধ্যায়কলকাতা ,বাংলার টেরাকোটা মন্দির আখ্যান ও অলংকরণ ,ও অভ্র বসু ,শ্রীলা ,বসু ,: সিগনেট প্রেস২০১৫ ,।

5. ভট্টার্চায্যকলক ,পশ্চিমবঙ্গের মন্দির ,শম্ভু ,োতা: মনন প্রকাশন২০০৯ ,।
6. রায়মেদিনীপুর ,বাংলার টেরাকোটা মন্দির স্থাপত্য ও ভার্স্কয ,প্রণব ,: পূর্বাদ্রি প্রকাশনী১৯৯৯ ,।
7. সান্যালকলকাতা ,বাংলার মন্দির ,হিতেশরঞ্জণ ,: কারিগর প্রকাশনী২০১৫ ,।
8. সাঁতরাপশ্চিমবাংলার ধর্মীয় স্থাপত্য মন্দির ও মস ,তারাপদ ,জিদকলকাতা ,: পশ্চিমবঙ্গ বাংলা একাদেমী , ।১৯৯৮
9. সাঁতরা,তারাপদ , পুরাকীর্তি সমীক্ষা: মেদিনীপুর (দ্বিতীয় সংস্করণ), কলকাতা: তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ , ২০১৭
10. Dasgupta, Prodosh, *Temple Terracotta of Bengal*, New Delhi: Crafts Museum, 1971.
11. Deva, Krishna, *Temples of North India*, New Delhi: National Book Trust, 1986
12. George, Michell(ed.), *Brick Temples of Bengal*, New Jersey: Princeton University Press, Princeton, 1983.
13. Ghosh, Pika, Temple to Love Architecture and Devotion in Seventeenth-Century Bengal, Bloomington: Indiana University Press.

ওয়েবসাইট:

http://www.paschimmedinipur.gov.in/node/206 Viewed on 10/04/2017
https://www.telegraphindia.com/ Viewed on 22/04/2017
http://www.midnapore.in/tourism_mid_pathra.html Viewed on 22/04/2017
http://www.bomadg.in/2014/08/mandir-moy-pathra-temples-of-bengal.html Viewed on 17/07/2017
http://www.bomadg.in/2014/08/mandir-moy-pathra-temples-of-bengal.html Viewed on 04/07/2017

তথ্যদাতা:

ইয়াসিন পাঠান (৬৫), গ্রাম- হাতিহলকা, পোষ্ট- রামনগর গোপীনাথপুর, জেলা- পশ্চিম মেদিনীপুর, পিন- ৭২১৩০৫

প্রভাষ ভট্টাচার্য (৬০), গ্রাম- বৃন্দা পাথরা, পোষ্ট- রামনগর গোপীনাথপুর, জেলা- পশ্চিম মেদিনীপুর, পিন- ৭২১৩০৫

কেতকী ভট্টাচার্য (৫৫), গ্রাম- বৃন্দা পাথরা, পোষ্ট- রামনগর গোপীনাথপুর, জেলা- পশ্চিম মেদিনীপুর, পিন- ৭২১৩০৫

জয়ন্ত কুমার সামন্ত (৪৫), গ্রাম- বৃন্দা পাথরা, পোষ্ট- রামনগর গোপীনাথপুর, জেলা- পশ্চিম মেদিনীপুর, পিন- ৭২১৩০৫

দীপক মহাপাত্র (৪৫), গ্রাম- বৃন্দা পাথরা, পোষ্ট- রামনগর গোপীনাথপুর, জেলা- পশ্চিম মেদিনীপুর, পিন- ৭২১৩০৫